ছেলেদের কাদম্বরী।

শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায় প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি,
২০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯১২।

মূল্য ।৵০ মাত্র

JUN 18

নিবেদন।

কবি বাণভট্টের সংস্কৃত কাদম্বরী একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ। কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ তাঁহারাও যেন ইহার রসাস্বাদন হইতে একেবারে বঞ্চিত না হন সেই নিমিত্ত পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্ন বঙ্গভাষায় উহার একখানি সুন্দর অনুবাদ রচনা করেন। সেই অনুবাদ খানিকে অবলম্বন করিয়া সম্প্রতি শ্রীচারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বি, এ, ও শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক একখানি কাদম্বরী সংস্কৃত মূলানুযায়ী করিয়া সম্পাদিত হইয়াছে।

কাদম্বরীর এই দুই খানি অনুবাদই বয়স্কদের জন্য রচিত—উহাদের মধ্যে বালকদের প্রবেশ পথ দুই কারণে বন্ধ। প্রথম কারণ, দন্তস্ফুট হয় না এমন দুরূহ ভাষা—পাঠ করিতে গেলেই ভীতির সঞ্চার হয়। দ্বিতীয় কারণ, বালকদের সম্মুখে ধরা যায় না স্থানে স্থানে এমন আপত্তিকর অংশ থাকায় পিতা মাতা অভিভাবক গুরুজনেরা পুস্তক দুইখানিকে বালক বালিকাদিগের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারেন না।

তাই ভাষাকে সরল করিয়া সৌন্দর্য্যকে যতটা পারি বজায় রাখিয়া, আপত্তিকর অংশগুলিকে বাদ দিয়া ছেলে মেয়েরা যাহাতে সকলের সাক্ষাতে পড়িতে পারে এমন করিয়া "ছেলেদের কাদম্বরী" প্রকাশ করিলাম।

প্রথম দিকটা নিজের ভাষায় লিখিয়া, শেষের দিকটা নানা কারণে তারাশঙ্করের ভাষাই অক্ষুন্ন রাখিয়া স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া পুস্তক খানিকে খাড়া করিয়াছি।

উপরোল্লিখিত দুই খানি অনুবাদের নিকটেই আমি ঋণী আছি—বিশেষভাবে তারাশঙ্করের অনুবাদের নিকট।

গ্রন্থকার।

উপক্রমণিকা।

নদী বেত্রবতীর স্রোত খরতর—ফু'লে ফু'লে, দু'লে দু'লে, পাকের পর পাক খেয়ে সাপের মত ফুঁসে ফুঁসে দুই কূলে ঘায়ের পর ঘা দিয়ে জল তার ছুটে চলে।

সেই নদীর তীরে ছিল বিদিশানগরী রাজা শূদ্রকের রাজধানী।

শূদ্রক ছিলেন রাজার মত রাজা—তাঁর শরীরে শক্তি ছিল অসুরের ন্যায় ভীষণ, মস্তিষ্কে বুদ্ধি ছিল সূক্ষ্ম কুশাগ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ, চিত্তে তেজ ছিল মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় রুদ্র, হৃদয়ে প্রেম ছিল বারিপূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় স্নিগ্ধ।

একদিন রাজা রাজসভায় বসিয়া আছেন এমন সময় দ্বারী আসিয়া সংবাদ দিল, দুয়ারে এক চণ্ডাল কন্যা উপস্থিত, সঙ্গে একটি শুকপক্ষী। ইচ্ছা, মহারাজের চরণে উহাকে অর্পণ করিয়া নিজের চণ্ডাল-জন্ম সার্থক করে।

দ্বারীর মুখের বাক্য নিঃশেষ হইলে শূদ্রক কন্যাকে লইয়া আসিবার জন্য আদেশ করিলেন। রাজার কথামত দ্বারী তাহাকে সঙ্গে করিয়া সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

মুক্তা-মণি খচা ঝক্‌ঝকে সিংহাসনে বসা রাজা, মাজা-ঘসা সর্ব্বশরীরে চক্‌চকে বেশভূষা। সম্মুখে চোক চেয়ে দেখলেন, পর পর তিন জন আগন্তুক—অগ্রে এক স্থবির, পশ্চাতে এক বালক, হস্তে পিঞ্জর ঝুলান, এই দুই এর মধ্যে লক্ষ্মীরূপী এক চণ্ডাল কন্যা।

নিকটে আসিয়া কন্যা রাজাকে প্রণাম করিলে পর বৃদ্ধ যুক্তকরে বিনীত স্বরে নিবেদন করিল—মহারাজ! এই শুকপাখী না জানে

এমন কোন বিদ্যা নাই—নৃত্য জানে, গীত জানে, সকল ভাষায় পণ্ডিত। মানুষের মত কথা বলে, তর্ক করে, বিচার করে। যে সব শাস্ত্রে পণ্ডিতেরা মূর্খ, চারিদিক অন্ধকার দেখে সেই সব শাস্ত্র এই শুকের চোখে আলোর মত পরিষ্কার। শুকটির নাম বৈশম্পায়ন।

নৃপতিগণের মধ্যে আপনার নাকি বিদ্যায় সর্ব্বোচ্চ আসন তাই আমাদের স্বামী-কন্যা এই শুকপাখীটিকে আপনার চরণে দান করিতে আসিয়াছেন। দয়া করিয়া পাখীটিকে গ্রহণ করিলে আমাদের সকল শ্রম সার্থক হয়—আনন্দের সীমা থাকে না।

এই বলিয়া স্থবির ভূতলে পিঞ্জর স্থাপন করিল। যাই পিঞ্জর রাখা অমনি শুক দক্ষিণ পদ তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল—মহারাজের জয় হউক।

শূদ্রক চমকিয়া উঠিলেন, কহিলেন—একি! এ যে মানুষের মত অবিকল স্বর। মন্ত্রি, শুনিলে পাখীর মুখে মানুষের কথা?—মহারাজের জয় হউক—।

রাজা মনে মনে ভাবিলেন এই পাখী যে সে পাখী নয়। তাই তাঁর খুব বড় রকমের একটা তাক্ লাগিয়া গেল।

রাজার কথায় মন্ত্রি কহিলেন, মহারাজ! আমার নিকটে কথা অপেক্ষা উহার দক্ষিণ পদ তোলা অধিক বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইল। আশীর্ব্বাদ করিতে হইলে ব্রাহ্মণেরা যেমন ডান হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকে এই শুকপাখীটিও তেমনি করিয়া ডান পা তুলিয়া আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিল—মহারাজের জয় হউক।

মন্ত্রীর, 'মহারাজের জয় হউক', এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সভা ভাঙার শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বেলা তখন দুপুর—সভা ভাঙ্গিয়া গেল।

পানের কৌটা-বাটা ধারী দাসীর প্রতি দৃষ্টি ফেলিয়া নৃপতি কহিলেন—বাটীর ভিতরে বৈশম্পায়নকে লইয়া যাও। স্নান করাইয়া দিয়া উত্তমরূপে পেট পুরিয়া আহার করাও। . . . . . .।

তার পর রাজা চণ্ডালকন্যাকে বিশ্রাম কবিতে আদেশ দিয়া আপনি আসন ত্যাগ করিলেন।

স্নান-পূজা-আহার শেষ করিয়া শূদ্রক শয্যায় হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন বটে কিন্তু সেদিন আর নিদ্রা গেলেন না। খোলা চোখে মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিবার পর দ্বারীকে হুকুম দিলেন—বৈশম্পায়নকে এই খানে লইয়া আইস।

দ্বারী হুকুম পাইয়া শুককে হাজির করিল। রাজা তখন হুস করিয়া এক নিঃশ্বাসে প্রশ্নের ঘাড়ে প্রশ্ন চাপাইয়া বসিলেন—

বৈশম্পায়ন তোমার পিতার নাম কি, মাতার নাম কি? কেমন করিয়া জন্ম হইল? কোন্ দেশেতে বাড়ী? শাস্ত্র জ্ঞান কেমন করিয়া জন্মিল? পূর্ব্ব জন্মের কথা কিছু স্মরণ আছে কি? তুমি কোন্ মহাপুরুষ? তপস্যার বলে শুকরূপ ধরিয়া কি এদেশ ওদেশ উড়িয়া বেড়াইতেছ? চণ্ডালের হাতে কেমন করিয়া কোথায় ধরা পড়িলে? পিঞ্জরে কোন্ দিন রুদ্ধ হইলে ইত্যাদি ইত্যাদি আরো কত শত প্রশ্ন।

প্রশ্নের ঝঞ্ঝাবাত পলকে থামিয়া গেলে বৈশম্পায়ন মস্তক তুলিয়া উৎসুক নৃপতিকে সবিনয়ে নিবেদন করিল, আমার জন্ম কথা শ্রবণ করুন—

সৌরজগতের সূর্য্যের মত, বৃত্তের কেন্দ্রের মত, ভারতবর্ষের মধ্যদেশে বিন্ধ্যাচল। বিন্ধ্যাচলের অদূরে এক ঘন বন আছে নাম তার বিন্ধ্যাটবী। ঐ বনের মধ্যে গোদাবরী তীরে অগস্ত্যমুনির আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমের নিকটে পম্পা সরোবরের পশ্চিম তীরে এক শাল্মলীবৃক্ষ আছে। বৃক্ষটি অতি বড় প্রকাণ্ড। অমন প্রকাণ্ড বৃক্ষ কোথাও বড় একটা জন্মায় না। দিন রাত তার মূল জড়িয়ে রইত মহা মোটা এক অজগর সর্প। বৃক্ষের শির যেন সূর্য্যলোক স্পর্শ করিয়াছে। অতি প্রাচীন বৃক্ষ—শেওলা-পড়া, স্বল্পপত্র, শিথিল বাকল। তরুটির গায়ে

গায়ে, বাকলের ফাঁকে ফাঁকে, ডালায় পালায়, খোড়লে হাজার হাজার পাখীর বাসা বাঁধা। পাখীর রং কোনটার লাল, কোনটার নীল, কোনটার শ্বেত, কোনটার পীত,—নানা বর্ণের নানা পাখী। কোন কোন পাখীকে ফল বলিয়া ভুল হইত, কোন কোন পাখীকে ফুল বলিয়া ভুল হইত, কোন কোন পাখীকে পাতা বলিয়া ভুল হইত। পাখীরা শ্রেণী বাঁধিয়া আকাশে উড়িতে থাকিলে মনে হইত যেন হরিৎ বর্ণের তৃণ-ভরা ক্ষেত আকাশ দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে।

আমার পিতা মাতা দিন কাটাইতেন সেই শাল্মলী-তরুর এক জীর্ণ কোটরে। জন্মিয়াই আমি মাতৃহীন হই। পিতা তখন বৃদ্ধ—চক্ষুর দৃষ্টি ক্ষীণ। ভালরূপে চলা ফেরা করিতে পারিতেন না তথাপি আমার আহার অন্বেষণ করিবার কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করিতেন না। ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে চারিদিক হাতড়াইয়া কোটর হইতে মূলে নামিয়া আসিয়া নিকটেই যাহা কিছু খাইবার মত পাইতেন প্রাণপণে দুর্ব্বল চঞ্চুর মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কোটরে ফিরিতেন, আসার সময় সারাপথ ভয়ে ভয়ে কাটিত পাছে কিছু দূর আসিয়া আহার দ্রব্য চঞ্চু হইতে খসিয়া পড়ে।

আমাকে পেট ভরিয়া অতিযত্নে আহার করাইয়া তার পর অবশিষ্ট যাহা কিছু থাকিত নিজে খাইতেন। কোন দিন কপালে কিছু জুটিত, কোন দিন বা উপবাসে কাটিত। এইরূপে পিতার আদর যত্নে দিনে দিনে বড় হইতে লাগিলাম।

সেই শাল্মলীতরুর মূলে একদিন এক বৃদ্ধ নিষাদ আসিয়া দাঁড়াইল। তখন পক্ষীগণ শাবকদের জন্য আহার অন্বেষণ করিতে উড়িয়া গিয়াছে।

রক্তজবার মত টক্‌টকে লাল, নক্ষত্রের মত ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল, ট্যালার মত গোল গোল ডাগর আঁখি গাছের গোড়া হতে ডগাপর্য্যন্ত কটকটিয়ে একবার ঘুরিয়ে দিয়ে, ব্যাধ মৈয়ে উঠার মত অতি সহজে

ঝাটা বেয়ে ছাল বেয়ে চট্‌পট্‌ তরুটিতে চড়িয়া বসিল। কয়লার ন্যায় কুচ্‌ কুচে কাল তার মুখ, কাশকুসুমের ন্যায় ধবধবে শ্বেত তার কেশ, মধুচক্রের ন্যায় বিলম্ব তার শ্মশ্রু, তালবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ তার আকৃতি, শরীরময় পশু পক্ষীর ছিট্‌ ছিট্‌ রক্ত দাগ—কৃতান্তরূপী ব্যাধ।

গাছে উঠিয়াই শিবের মত সদ্যোজাত কচি ডানা ধরিয়া কোন কোন শাবককে ছুড়িয়া দিল, কাহাকেও বা পা ধরিয়া হিড়্‌ হিড়্‌ করিয়া টানিয়া শূন্যে উড়াইয়া মারিল, কতকগুলির তুলার মত নরম গলা টিপিয়া দিল, কারুর ঠোঁট গাছের গায়ে ঠুকিয়া নীচে নিক্ষেপ করিল।

মাটিতে পড়িয়াই কোন কোন শাবকের পা ভাঙ্গিয়া গেল কিন্তু প্রাণে মরিল না, কতকগুলি পড়িয়াই মরিয়া গেল, কোন কোনটা চা-চা-চা, চি-চি-চি শব্দ করিয়া ছট্‌ফট করিতে লাগিল, কতকগুলি রব না করিয়া ডানা ঝাট্‌ পটিয়ে চোখ বুজিল।

বিপদ জানিয়া পিতা আমাকে পাখায় ঢাকিয়া বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন, এমন সময় সাপের ব্যাঙ ধরার মত ব্যাধ পিতার গলা খপ্‌ করিয়া ধরিয়া রজকের কাপড় কাচানমত গাছে আছড়াইয়া মারিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল—উঃ। কি আশ্চর্য্য আমি কিন্তু বাঁচিয়া গেলাম। কি কৌশলে পিতা যে আমায় ডানার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিলেন তাহা বলিতে পারি না। মাটিতে পড়িয়াই কি জানি কার বলে সম্মুখে চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর গিয়াই দেখি এক তমালতরু। তাহারই মূলে গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে লুকাইলাম। ব্যাধ তখন নামিয়া আসিল এবং পাতিত পক্ষী শাবকগুলিকে লতায় বাঁধিয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিল।

এদিকে পিপাসায় ক্লান্তিতে আমার প্রাণ যায় যায়—আমি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। আশে পাশে কোন স্থানে পানীয় মিলিবে, সেই আশায় মূলদেশ হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। বাহির হইয়াই দেখি,

নিকটেই এক সরোবর। তখন সূর্য্য আমার মাথার উপরে—ঝাঁঝাঁ রৌদ্র। পায়ের নীচে তপ্ত বালু। কড়াতে মাছ পোড়ার মত পুড়িতে পুড়িতে চলিলাম। পবন তখন আগুন। কিন্তু আমার মৃত্যু ছিল না। বিধাতা আমায় মারিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই। বোধ হয় তাই আমাকে বাঁচাইবার জন্যই মহর্ষি জাবালীর পুত্র হারীত সেই পথ দিয়া তখন সরোবরে স্নান করিতে যাইতেছিলেন। সঙ্গে ছিল ঋষিকুমারগণ। হারীতের মাথায় জটাজুট, ললাটে ভস্মরেখা—ধনুকের ন্যায় বাঁকা, কর্ণে স্ফটিকের মালা, বামকরে কমণ্ডলু, দক্ষিণ করে পলাশ-যষ্টি, স্কন্ধে মৃগ-চর্ম্ম, কণ্ঠে যজ্ঞোপবীত।

আমাকে দেখিয়া তিনি তর্জ্জণী নাড়িয়া ঋষিকুমাদের কহিলেন—দেখ দেখ কেমন সুন্দর একটি শুকশিশু, সম্ভবত শাল্মলীতরু হইতে পতিত হইয়াছে। কত ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে, চঞ্চু ব্যাদন করি-তেছে, হয় তো পিপাসা লাগিয়া থাকিবে, চল আমরা উহাকে সরোবরে লইয়া যাই।

এই বলিয়া আমাকে ভূতল হইতে কোলে তুলিয়া লইয়া সরোবরে গিয়া আমার মুখে জল দিয়া তৃষ্ণা দূর করিয়া দিলেন। পরে স্নান করা-ইয়া এক পদ্মপত্রের ছায়ায় বসাইয়া রাখিলেন। তারপর ঋষিকুমারেরা স্নান করিয়া সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য দিয়া প্রণাম করিয়া, আমায় তপোবনে লইয়া আসিলেন। আমি নয়ন ভরিয়া তপোবনের স্নিগ্ধ শোভা দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম—নব নব কিশলয়, গুল্ম-তরু-লতায় পুষ্প বিকশিত, ফলভরে শাখা-শির অবনত, কুসুম-সৌরভে দিক আমোদিত, পুষ্পেপুষ্পে উড়ে উড়ে মধুকর মধুপানে রত, তাদের গুন্ গুন্ ঝঙ্কারে বনরাজি মুখরিত, পক্ষীর শিশ-গান, পশুর নাচ-ডাক, চারিদিকে আনন্দ শান্তি বিরাজিত। সেথায় হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, পশুতে পাখিতে মানুষে প্রেমের সম্বন্ধ, কাটা-কাটি হানা-হানি স্বার্থে-স্বার্থে বিরোধ নাই,

তুচ্ছ বাক্য নাই—আছে শুধু ব্রহ্ম-কথা ঋষিদের বেদ-মন্ত্র পাঠ ব্রহ্ম-জ্ঞান ব্রহ্ম-ধ্যান।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখি এক অশোকতরু। তার পত্র লাল, গাত্র লাল। সেই তরুর ছায়ায় মুনিগণ বেষ্টিত হইয়া বেত্রাসনে বসিয়া মহর্ষি জাবালি—হারীতের জনক। তিনি ছিলেন তপোবন-ঋষি-রাজ। জরাগ্রস্থ, শ্বেত-জটাভার, ত্রিবলীদাগা ললাট, ভগ্নগণ্ড, নির্গত পঞ্জরশিরা, শ্বেত-লোমপূর্ণ গাত্র ও কর্ণ-বিবর।

হারীত আমাকে অশোকের ছায়ায় রাখিয়া পিতা জাবালিকে প্রণাম করিয়া নিজের আসন গ্রহণ করিলেন। মুনিকুমারেরা তখন হারীতকে জিজ্ঞাসা করিল—সখা, এই শুকশিশুটিকে কোথায় পাইলে? হারীত কহিলেন স্নান করিতে যাইবার সময় পথে দেখিলাম এই শিশু কুলায় হইতে পতিত হইয়া ভূতলে লুটাইতেছে। যে বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়াছিল তাহাতে আরোহণ করা আমাদের অসাধ্য ছিল তাই সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছি। হারীতের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ জাবালি আমার প্রতি কটাক্ষ-পাত-করিলেন, এবং বলিলেন—এই পাখী আপন দুষ্কর্মের ফল ভোগ করিতেছে।

মহর্ষি জাবালি ছিলেন ত্রিকালজ্ঞ। তাই সকলে ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কি দুষ্কর্ম করিয়াছে? কিরূপেই বা তার ফলভোগ করিতেছে? পূর্ব্বজন্মে এ কোন্ জাতি ছিল? কেনই বা এখন পাখী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল? সকল বৃত্তান্ত আমাদের নিকট বর্ণনা করুণ।

শুনিবার জন্য সকলে একাগ্র চিত্ত হইলে জাবালি কথা আরম্ভ করিলেন—

ছেলেদের কাদম্বরী।

কথারম্ভ।

জ্ঞানে সরস্বতী ধনে লক্ষ্মী ছিলেন তাবাপীড—উজ্জয়িনীর রাজা। নাম-যশ তাঁর কুসুম-সৌরভের মত দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রজাদিগের কোন প্রকার ভয়ের কারণ ছিল না—আনন্দে তাদের দিন কাটতো। ঘর-বাহির সমস্ত নগরী শান্তিতে পূর্ণ ছিল। উজ্জয়িনী যেন একখানি স্বর্গপুরী—বর্ণনার অতীত এমনই সুন্দব।

শুকনাস ছিলেন রাজাব মন্ত্রী—অগাধ বুদ্ধি, সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত, ধীর প্রকৃতি, সত্যবাদী ও সংযমী। ব্রাহ্মণ-কুলে তাঁর জন্ম ছিল। ইন্দ্রের নিকট বৃহস্পতি যেমন, নলেব নিকট সুমতি যেমন, দশরথের নিকট বশিষ্ঠ যেমন, রামচন্দ্রের নিকট বিশ্বামিত্র যেমন, রাজা তাবাপীড়ের নিকট মন্ত্রী শুকনাসও ঠিক তেমনতরই ছিলেন—রাজকার্য্য-পবিচালনা বিষয়ে রাজাকে যথাযথ-উপদেশ দিয়া থাকিতেন। অতি শিশুকাল হইতেই উভয়ের মধ্যে একটি অকৃত্রিম প্রণয় বেশ জমাট বাঁধিয়া উঠে।

রূপবতী বিলাসবতী ছিলেন তারাপীড়ের পত্নী। বহুদিন ধরিয়া নিয়মিতরূপে দেবতাদিগেব আরাধনা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণপাত্র দান

করিয়া, দিবস-বিশেষে কুশাসনে শয়ন করিয়া অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ-সমূহকে প্রদক্ষিণ করিয়া তবে তিনি এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। যেদিন পুত্রের জন্ম হয় সেই দিন নগরীমধ্যে চারিদিকে কতই আনন্দরোল, রাজবাটীতে হর্ষোৎসবের ধূম-ধাম, গৃহে-গৃহে নৃত্য-গীত কতই না বাদ্য-যন্ত্র বাজিয়া উঠে। সেদিন রাজার আদেশে পথের অনাথ-কাঙালেরা অর্থ পায়, অন্ন পায়, বস্ত্র পায়। বন্দিশালায় বন্দিরা মুক্তি পায়—উজ্জয়িনীর পক্ষে সেই দিন এক মহাদিন।

কার্ত্তিকের ন্যায় রাজপুত্রের রূপলাবণ্যে রাজগৃহ আলো হইয়া উঠিল। কুমারের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চক্রবর্ত্তী ভূপতির চিহ্নযুক্ত ছিল—করতলে শঙ্খচক্ররেখা, চরণতলে পতাকারেখা, প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘ লোচন, উন্নত নাসিকা, লোহিত অধর।

দশম দিবসে পবিত্র মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ দিয়া, গাভী দিয়া, দীন-দুঃখীকে ধন দিয়া তারাপীড় পুত্রের নাম রাখিলেন চন্দ্রাপীড়।

রাজকুমারের জন্মদিনে মন্ত্রী শুকনাসেরও এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। মন্ত্রীও ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন-পূর্ব্বক রাজার অভিমতে আপন পুত্রের নাম রাখিলেন—বৈশম্পায়ন।

আমোদ-প্রমোদ নানাপ্রকার ক্রীড়ায় দুর্লভ সময় বৃথায় ক্ষেপন না হয় এই নিমিত্ত উজ্জয়িনীর প্রান্তে শিপ্রানদীর তীরে রাজা বিদ্যা-মন্দির প্রস্তুত করাইয়া বিখ্যাত শিক্ষকগণের হস্তে কুমারদ্বয়ের শিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। শুধু বিদ্যাশিক্ষায় ফল নাই, মন্দিরসংলগ্ন ভূমিতে তাই ব্যায়ামশালা ও অশ্বশালা নির্ম্মিত হইল।

দেখিতে দেখিতে অল্পকালের মধ্যেই শব্দ-শাস্ত্র, বিজ্ঞান-শাস্ত্র, রাজ-নীতি, ব্যায়াম-কৌশল, অস্ত্র ও সঙ্গীত-বিদ্যা, কাব্য, নাটক, ইতিহাস প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই চন্দ্রাপীড় বেশ আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। শরীরে যথেষ্ট শক্তির সঞ্চার হইল—দশজন বলবান্ পুরুষের পক্ষে যে মুদ্গর

উত্তোলন অসম্ভব ছিল তাহা তিনি অতি সহজেই তুলিয়া ফেলিতেন। পদ ধরিয়া হস্তীর গতি রোধ করিয়া দিতেন।

বৈশম্পায়ন সকল বিদ্যাতেই চন্দ্রাপীড়ের তুল্য হইয়া দাঁড়াইলেন, কেবল আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না শারীরিক শক্তিতে। শিশুকাল হইতে একত্র বাস করাতে, একত্র বিদ্যা শিক্ষা করাতে দুজনকার মধ্যে এমন একটা বন্ধুত্ব জন্মিয়া গেল যে একে অন্যকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিতেন না।

যখন উভয়েই যৌবনে আসিয়া পদার্পণ করিলেন, যখন বক্ষঃস্থল বিশাল, ঊরুযুগল মাংসল, মধ্যভাগ ক্ষীণ, ভুজদ্বয় দীর্ঘ, স্কন্ধদেশ স্থূল, স্বর গম্ভীর হইল, যখন তাঁদের যৌবনের রূপ আর ধরে না—গোধূলির চন্দ্রের মত, বর্ষার ইন্দ্রধনুর মত, পুষ্পোদগমে কল্পপাদপের মত সুন্দর তাঁরা যখন সকল বিদ্যার শেষে আসিয়া পৌছিলেন, রাজা তারাপীড় তখন বন্ধুদ্বয়কে বাটিতে আনিবার জন্য সেনাধ্যক্ষ বলাহককে বিদ্যা-মন্দিরে পাঠাইয়া দিলেন। বলাহকের সঙ্গে গেল লক্ষ লক্ষ সৈন্য, অশ্ব, হস্তী।

চন্দ্রাপীড়ের জন্য যে ঘোটক পাঠান হয় তাহার নাম ছিল ইন্দ্রায়ুধ—গরুড় এবং বায়ুর ন্যায় গতি। সাগরের মধ্য হইতে উহা উত্থিত হয়। পারস্য দেশের অধিপতি, মহারাজ তারাপীড়কে উহা উপহার দেন। সমুদ্রজাত উচ্চৈঃশ্রবার সমস্ত লক্ষণই ইন্দ্রায়ুধে বর্ত্তমান ছিল—বৃহৎ, স্থূল-কায়, মহাতেজস্বী, বেগশালী ও বলবান্।

অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চন্দ্রাপীড় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—এ প্রকৃত ঘোটক নহে, কোন মহাত্মা শাপগ্রস্ত হইয়া অশ্ব-রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন। এই ভাবিতে ভাবিতে নগরের পথ দিয়া প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিল সেনা-ধ্যক্ষ বলাহক, পশ্চাতে চলিলেন তাঁহার বন্ধু বৈশম্পায়ন।

রাজপুত্র চন্দ্রাপীড় গৃহে ফিরিতেছেন এই সংবাদে কেহ জানালা খুলিল, কেহ দরজা খুলিল, কেহ কার্নিশে চড়িয়া বসিল, কেহ ছাদে উঠিল, কেহ পথে বাহির হইয়া পড়িল, কেহ গাছে উঠিল,—যে যে ভাবে পারিল একবার সতৃষ্ণ নয়নে কুমার-মুখ দেখিয়া লইল। ছেলেদের মধ্যে কেহ বা গল্প-গুজব ফেলিয়া, কেহ বা খেলা-ধুলা ঝগড়া-ঝাঁটি ফেলিয়া. মেয়ে-দের মধ্যে কেহ বা রন্ধন ফেলিয়া, কেহ বা কেশ বাঁধিতে বাঁধিতে, কেহ বা আল্‌তা পরিতে পরিতে ছুটিয়া আসিল।

ইন্দ্রায়ুধ রাজপ্রাসাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলে পর রাজপুত্র অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। রাজভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, হাজার হাজার দ্বারী দ্বারে দণ্ডায়মান—সর্ব্বশরীর অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত। দ্বারদেশ পার হইয়া দেখিলেন, এদিকে অস্ত্রশালা—তাতে ধনু আছে, বান আছে, তরবারি আছে. ঢাল আছে, আরো কত কি অস্ত্র আছে, ওদিকে পশুশালা—তাতে সিংহ আছে, গণ্ডার আছে, করী আছে, করভ আছে, ব্যাঘ্র আছে, ভল্লুক আছে—আরো কত কি হিংস্র পশু আছে, তাহাদের বিকট চীৎকার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পক্ষিশালা পক্ষিপরিপূর্ণ—চাতক, ময়ুর, কোকিল, শুক, শারিকা প্রভৃতি পক্ষীর মধুর কূজনে পক্ষিশালা মুখরিত। সঙ্গীতশালা—বেণু, বীণা, মুরজ, মৃদঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রে বিভূষিত। কোথাও কৃত্রিম ক্রীড়া-পর্ব্বত, কোথাও মনোহর সরোবর, কোথাও সুরম্য জলযন্ত্র, স্থানে স্থানে রমণীয় বন উপবন।

এই সমুদয় অবলোকন করিতে করিতে চন্দ্রাপীড় পিতার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারাপীড় তখন শয্যায় শুইয়াছিলেন। শয্যা হইতে উত্থান করিয়া প্রণত-পুত্র চন্দ্রাপীড় এবং মন্ত্রীপুত্র বৈশম্পায়নকে বুকভরা আনন্দে আলিঙ্গন করিলেন।

ক্ষণকাল পরে রাজকুমার জননীর নিকট গমন করিলেন। বিলাসবতী

স্নিগ্ধ ও প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে পুত্রকে পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া শরীর মস্তক হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া আপনার অঙ্কে লইয়া বসিলেন।

অনন্তর রাজকুমার তাঁহার বন্ধু বৈশম্পায়নকে সঙ্গে করিয়া শুকনাসের সভামণ্ডপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আসন হইতে উত্থান করিয়া শুকনাস প্রণতপুত্র ও রাজকুমারকে যুগপৎ আলিঙ্গন করিলেন।

রাজকুমার তারপর মন্ত্রী পত্নী মনোরমার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভক্তির সহিত নমস্কার করিয়া গৃহে আসিয়া স্নান-ভোজন প্রভৃতি সমুদয় কর্ম্ম সমাপন করিলেন।

রাজকুমারকে নিকটে পাইয়া রাজবাটীর সকলের দিন কয়েক আনন্দে কাটিলে পর, রাজা চন্দ্রাপীড়কে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে অভিলাষ করিলেন। রাজকুমার যুবরাজ হইবেন এই ঘোষণা সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়ায় রাজবাটী মহোৎসবময় ও নগর আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। অভিষেকের সামগ্রীসমূহ সংগ্রহের নিমিত্ত কত হাজার হাজার লোক দিগ্‌দিগন্তে প্রেরিত হইল।

দেখিতে দেখিতে অভিষেকের যত কিছু দ্রব্য অল্প দিনের মধ্যেই জড় হইয়া উঠিল। রাজা তারাপীড় তখন শুভদিন দেখিয়া শুভ লগ্ন দেখিয়া পুরোহিতের মন্ত্রে পূত হইয়াছে এমন তীর্থের জলে নদীর জলে সাগরের জলে রাজকুমারের অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অভিষেকের শেষে ধবল বসন ও উজ্জ্বল ভূষণ মনোহর মাল্য পরিধান করিয়া যুবরাজ যখন রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন মনে হইতে লাগিল যেন সুমেরুশৃঙ্গে শশধর শোভা পাইতেছেন। পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রাজা তারাপীড় এতদিনে নিশ্চিন্ত হইলেন।

রাজ্য সম্ভোগ করিবার কিছুদিন পর যুবরাজ দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সেনাগণ বহির্গত হইল। অস্ত্র সকল শানিত থাকায় সূর্য্য কিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। হস্তীর গর্জ্জনে,

অশ্বের হ্রেষারবে, দুন্দুভির ভীষণশব্দে, সৈন্যের কলরবে, চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইয়া গেল। পথের ধূলায় আকাশ ধূসর হইয়া উঠিল।

যুবরাজ বহুদেশ জয় করিয়া অবশেষে সুবর্ণপুর নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ নগরী ছিল কিরাতদিগের অধীনে—কৈলাসপর্ব্বতের অনতিদূরে। রণে কিরাতদিগকে হটাইয়া দিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত সেনাগণকে লইয়া যুবরাজ সেই নগরীতে কিছুকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

একদা তথা হইতে মৃগয়ার জন্য বহির্গত হইয়া দেখিলেন বনে একটি কিন্নর ও একটি কিন্নরী ভ্রমণ করিতেছে। কিন্নরকিন্নরীদের মুখ অশ্বের ন্যায়, শরীর মনুষ্যের ন্যায়—তারা দেবলোকের গায়ক।

অপরূপ কিন্নরমিথুন ধরিবার আশায় যুবরাজ তাঁহার অশ্বকে তীরবেগে ছুটাইয়া দিলেন। কিন্নরমিথুন এদিকে ভীত হইয়া প্রাণপণে দৌড়াইয়া গিয়া এক পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিল। অশ্ব কিন্তু তথায় পৌছিতে পারিল না। যুবরাজ আর কি করিবেন—বিমর্ষচিত্তে পর্ব্বতের উপত্যকা হইতে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। কিন্নরমিথুন শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। যুবরাজ চন্দ্রাপীড়ের নেশা তখন ছুটিয়া গেল। আপনমনে হাসিয়া কহিলেন—কি ছেলেখেলাই খেলিয়াছি, কিন্নরমিথুন ধরা কি মানুষের কাজ? ধরিতে পারিলেই বা কি ফল হইত?

ছুটিতে ছুটিতে যুবরাজ কিন্তু সেনানিবেশ হইতে বহুদূরে গিয়া পড়েন। একে সে বন নিবিড় বন, তাতে আবার পরিচিত বন নয়—বাহির হইবার পথ কোথায় তাহার সন্ধান কিছুই জানেন না। লোকজনের সে বনে যাতায়াত নাই। সেনানিবেশে গিয়া কি করিয়া পৌছান বড়ই ভাবনার বিষয় হইয়া উঠিল। কানে শোনা ছিল সুবর্ণপুরের উত্তরে গহন বন, বন পার হইলেই কৈলাসপর্ব্বত। অনুমানের উপর তাই বুক বাঁধিয়া দক্ষিণমুখে চলিতে লাগিলেন। ভাবিলেন এই পর্ব্বত যদি অন্য

পর্ব্বত না হইয়া কৈলাসপর্ব্বত হয় তবে ঠিক স্থানে গিয়া পৌছিতে পারিব।

বেলা তখন দুই প্রহর। অশ্ব পরিশ্রান্ত—ঘর্ম্মে শরীর সিক্ত। যুবরাজও তৃষ্ণাতুর। কোন এক বৃক্ষ-ছায়ায় অশ্বকে বন্ধন করিয়া হরিদ্বর্ণ দুর্ব্বাদলের উপর শয়ন করিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর কিয়দ্দুর গমন করিয়া দেখিলেন এক সরোবর। তার জল অতি নির্ম্মল—নাম অচ্ছোদ সরোবর। জলে কমল-কুমুদ প্রভৃতি নানাবিধ কুসুম বিকশিত হইয়াছে। মধুকর গুন্‌গুন্ ধ্বনি করিয়া এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে বসিয়া মধুপান করিতেছে। কলহংস সকল কলরব করিয়া কেলি করিতেছে। কুসুমের সুরভিরেণু হরণ করিয়া শীতল সমীরণ নানাদিকে সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। সরোবরের চতুর্দ্দিক কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেখানকার অনির্ব্বচনীয় শোভায় যুবরাজের নয়ন-মন মুগ্ধ হইল। তিনি সরোবরের দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এমন সময় সরসীর উত্তর তীরে সুললিত সঙ্গীতের ধ্বনি উঠিল। সেই সঙ্গীতে মোহনবীণা-তন্ত্রীর ঝঙ্কার জড়িত ছিল। শব্দ শুনিবামাত্র ইন্দ্রায়ুধ তাহার কর্ণ খাড়া করিল। যুবরাজ সরসীর উত্তর তীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না—অরণ্য জনশূন্য। কুতুহলাক্রান্ত হইয়া ঘোটকে আরোহণপূর্ব্বক শব্দকে অনুসরণ করিয়া চলিলেন। সঙ্গীত এমনই মধুর যেন সুধা ক্ষরিতেছিল। বনের পশুপক্ষী তাই সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া নৃত্য করিতেছিল। কিয়দ্দুর গমন করিয়াই দেখিলেন এক রমণীয় উপবন। মধ্যদেশে তার এক পর্ব্বত—চতুর্দ্দিক বৃক্ষে সমাকীর্ণ। উহাদের রং মরকত-মণির ন্যায় হরিৎ। সবুজবর্ণের শুক পক্ষিকুল বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া শব্দ করিতে করিতে পিঙ্গল বর্ণের ফল ভক্ষণ করিতেছে। বৃক্ষের পল্লব যত অলক্তের মত লোহিত, নলকের ন্যায় পবনে দুলিতেছে। ঐ পর্ব্বতের নিম্নে এক মন্দির। মন্দিরের

অভ্যন্তরে ভগবান্ শূলপাণির প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রতিমার সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে চারিদিকে চারিটি স্তম্ভ। মস্তকের উপর স্ফটিক-মণ্ডপ। শ্বেত-শিলা নির্ম্মিত সেই প্রতিমূর্ত্তি—তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া নবীনবয়সের এক সুন্দরী কন্যা—গর্ব্বশূন্য, সর্ব্বপ্রকার-বাসনাশূন্য। দুগ্ধের ন্যায় ধবল দেহ—দেহের প্রভায় গিরি-বনরাজি সমুজ্জ্বল, মন্দির উদ্ভাসিত। জ্যোৎস্নার ন্যায় তরল তাঁর রূপ, গঙ্গা-জলের মত পবিত্র। স্কন্ধে তার জটাভার, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, গাত্রে তাঁর ভস্মলেপ। শঙ্খ খণ্ডের ন্যায় শুভ্র অঙ্গুলি-স্পর্শে বীণার তন্ত্রীরাজিতে ঝঙ্কার সৃজন করিয়া তানলয় বিশুদ্ধ মধুর সঙ্গীতে মহাদেবের বন্দনা করিতেছেন।

অশ্বকে বৃক্ষে বাঁধিয়া রাজকুমার ভগবান্ ত্রিলোচনকে প্রণিপাত করিলেন অনন্তর সেই মন্দিরের এক কোণে উপবেশন পূর্ব্বক সঙ্গীত শেষের অপেক্ষায় রহিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সঙ্গীত এবং বীণা নীরব হইল। কন্যা ভগবান্ ত্রিলোচনকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। তারপর রাজকুমারের প্রতি দৃষ্টি ফেলিয়া বিনীতভাবে কহিলেন—মহাশয়! আশ্রমে চলুন, অতিথিসৎকার গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ করুন। রাজকুমার তাপসীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কতকদূর গমন করিয়া দেখিলেন—এক গিরি-গুহা, চারিপাশে ঘন তমালবন—সূর্য্য কিরণের পথ রোধ করা। পার্শ্বে এক নির্ঝর ঝর্ ঝর্ শব্দে পতিত হইতেছে। গুহার অভ্যন্তরে বল্কল, কমণ্ডলু ও ভিক্ষাপাত্র।

দুইজনে দুই শিলাতলে উপবিষ্ট হইলে তাপসী রাজকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকুমার তাঁহার নাম-ধাম, দিগ্বিজয়ের কথা, কিন্নরমিথুনের অনুসরণ ব্যাপার সব বর্ণনা করিলেন।

অনন্তর তাপসী ভিক্ষাপাত্র ধারণ করিয়া বৃক্ষতলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সুস্বাদু সুপক্ব ফলসমূহ বৃন্ত হইতে চ্যুত হইয়া তাঁহার

পাত্রে পড়িয়া পাত্র পূর্ণ করিয়া দিল। চন্দ্রাপীড় এই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অতঃপর তাপসীর অনুরোধে পক্কফল ভক্ষণ ও শীতল জল পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন।

দিন অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত। তাপসী তখন উপাসনায় রত হইলেন। উপাসনার অবসানে তিনি যখন এক শিলাতলে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন চন্দ্রাপীড় তখন বিনয় বাক্যে কহিলেন—ভগবতি! আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ করিতেছি। আপনি কে? কোন্ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন? কেনই বা এই নবীন বয়সে কঠিন তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন? নির্জ্জন বনে একাকিনী বাস করিতেছেন?

তাপসী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন—রাজপুত্র! অভাগিনীর জীবনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কি ফল পাইবেন, যদি শুনিতে নিতান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে তবে শ্রবণ করুন—

ভারতবর্ষের উত্তরে কিম্পুরুষবর্ষে এক পর্ব্বত আছে নাম তার হেমকূট। সেই পর্ব্বতে চিত্ররথের বাস। তিনি গন্ধর্ব্বলোকের অধিপতি। তিনিই চৈত্ররথ নামে এই রমণীয় কানন, অচ্ছোদ নামে ঐ সরোবর ও ভবানীপতির এই প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছেন।

হংস ছিলেন চিত্ররথের ভুবন বিখ্যাত প্রজা। তাঁহারও বাসস্থান ছিল হেমকূটে। চিত্ররথ প্রজা হংসকে আপন রাজ্যের কিঞ্চিৎ অংশ দান করিয়া তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। পরমাসুন্দরী অপ্সরা গৌরী ছিলেন হংসের পত্নী—জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ তাঁর রূপ, দেব-পূজার পুষ্পের মত পবিত্র তাঁর হৃদয়। এই হতভাগিনী ও চিরদুঃখিনী তাঁহাদিগের একমাত্র কন্যা—নাম মহাশ্বেতা।

একদিন আমি আমার মাতার সহিত এই সরোবরে স্নান করিতে আসি—তখন মধু-মাস। আম্রমুকুল অঙ্কুরিত, কমলবনে কমলরাজি

বিকশিত, মন্দ মলয়মারুত প্রবাহিত, কোকিলের কুহু কুহু স্বরে কানন মুখরিত, ভ্রমরের গুন্ গুন্ ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত, বকুল-মুকুল উদ্গত, অশোক কিংশুক প্রস্ফুটিত, দিকে দিকে আনন্দরস উদ্বেলিত। রূপ-রস-গন্ধে আমি পাগল হইয়া উঠিলাম। নিজেকে নিজের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারি আমার সে শক্তি রহিল না। এমন সময় দেখিলাম এক মুনি-কুমার সরোবরে স্নান করিতে আসিতেছেন—মহাতেজস্বী, পরম রূপ-বান, কর্ণে কুসুম-মঞ্জরী, স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত, পরিধানে মন্দার বল্কল। দেহকান্তি গৌরবর্ণ। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন অন্য এক তাপসকুমার।

মুনিজনেরা সকলের পূজনীয় ও নমস্য বিবেচনা করিয়া প্রণাম করিলাম। পরে দ্বিতীয় ঋষিকুমারের নিকট গমন করিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবান! ইঁহার নাম কি? ইনি কোন্ তপোধনের পুত্র? ইঁহার কর্ণে যে কুসুম-মঞ্জরী দেখিতেছি উহা কোন্ তরুর সম্পত্তি? আহা! উহার কি সৌরভ—আমি কখন ঐরূপ সৌরভ আঘ্রাণ করি নাই।

আমার কথায় তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন বালা! তোমার ইহা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি? যদি শুনিতে নিতান্ত কৌতুক জন্মিয়া থাকে শ্রবণ কর—

শ্বেতকেতু নামে এক মহর্ষি দিব্যলোকে বাস করেন—জগদ্বিখ্যাত তাঁহার রূপ। একদা তিনি দেবার্চ্চনার নিমিত্ত কমল কুসুম তুলিতে মন্দাকিনী প্রবাহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তখন কমলাসনা লক্ষ্মীর কোলে এক অপরূপ কুমার জন্ম গ্রহণ করেন। "ইনি তোমার পুত্র হইলেন, গ্রহণ কর" বলিয়া লক্ষ্মী শ্বেতকেতুকে সেই পুত্র সন্তান সমর্পণ করেন। শ্বেতপদ্মের উপর জন্মিয়াছিলেন বলিয়া মহর্ষি পুত্রের নাম রাখিলেন—পুণ্ডরীক। যাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইনি সেই পুণ্ডরীক।

পূর্ব্বে অসুর ও সুরগণ যখন ক্ষীরসাগর মন্থন করেন তৎকালে পারিজাত বৃক্ষ তথা হইতে উদ্গত হয়। এই কুসুম-মঞ্জরী সেই পারিজাত বৃক্ষের সম্পত্তি।

ঋষিকুমার এইরূপ পরিচয় দিতেছেন এমন সময় সেই তপোধন যুবা অগ্রসর হইয়া কহিলেন, ওগো কুতূহলাক্রান্তা! তোমার এত অনুসন্ধানে প্রয়োজন কি? যদি কুসুম-মঞ্জরী লইবার বাসনা থাকে, গ্রহণ কর, এই বলিয়া আমার কর্ণে পরাইয়া দিলেন।

পরাইয়া দিয়াই তাঁহার মনে লজ্জার সঞ্চার হওয়ায় সকল শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। অক্ষমালা হস্ত হইতে ভূতলে পতিত হইল। তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। আমি সেই অক্ষমালা তুলিয়া লইয়া কণ্ঠে ধারণ করিলাম। তখন ছত্রধারিণী আসিয়া বলিল রাজকন্যা! দেবী স্নান করিয়া তোমার অপেক্ষা করিতেছেন, তোমার আর বিলম্ব করা বিধেয় নয়। মাতা অপেক্ষা করিতেছেন শুনিয়া আমি স্নানার্থ গমন করিলাম।

আমাকে যাইতে দেখিয়া দ্বিতীয় ঋষিকুমার, তপোধন যুবার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন—পুণ্ডরীক! একি, তোমার রুদ্রাক্ষমালা কোথায়? করতল হইতে উহা অপহৃত হইয়াছে দেখিতে পাও নাই? কি আশ্চর্য্য! একেবারে জ্ঞানশূন্য ও চৈতন্যশূন্য হইয়াছ? ঐ অভদ্রবালা অক্ষমালা হরণ করিয়া পলায়ন করিতেছে তুমি কোন্ স্বপ্নের মধ্যে বিভোর হইয়াছ?

পুণ্ডরীক তখন আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অলীক রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন চপলা! আমার অক্ষমালা না দিয়া এখান হইতে যাইতে পাইবে না। আমি তাঁহার মধুর কণ্ঠে তন্ময় হইয়া অক্ষমালা ভ্রমে আমার একাবলীমালা তাঁহার করে প্রদান করিলাম। তিনিও এরূপ অন্যমনস্ক হইয়া আমার মুখেরদিকে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়াছিলেন যে উহা অক্ষমালা বলিয়াই গ্রহণ করিলেন।

স্নান সম্পন্ন করিয়া আমি গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম। পানের কৌটা-বাটা-ধারী আমার তরলিকাও স্নান করিতে গিয়াছিল। অনেক-ক্ষণের পর সে বাটী আসিয়া আমাকে কহিল, রাজকন্যা! যিনি তোমার কর্ণে কুসুম-মঞ্জরী পরাইয়া দেন সেই তাপসকুমার আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বালা! যাঁহার গলায় আমি পুষ্প মঞ্জরী পরাইয়া দিলাম ইনি কে? ইঁহার নাম কি? কাহার অপত্য? কোথায় বা গমন করিলেন?

আমি বিনীত বচনে কহিলাম, ভগবান! ইনি গন্ধর্ব্বের অধি-পতি হংসের দুহিতা—নাম মহাশ্বেতা। হেমকুট পর্ব্বতে গন্ধর্ব্বলোকে বাস করেন, তথায় গমন করিলেন।

আমার কথা শেষ হইলে তিনি পরিধেয় বাকল হইতে এক খণ্ড বাকল ছিঁড়িয়া তমালতরুর পল্লবের রসে নখদ্বারা উহাতে এই পত্রিকা লিখিয়া আমার হস্তে দিয়া কহিলেন—মহাশ্বেতার করে সমর্পণ করিও।

তরলিকার কথা শেষ হইতে না হইতেই আমি হর্ষোৎফুল্ল লোচনে তরলিকার হস্ত হইতে পত্রিকা গ্রহণ করিলাম। এমন সময় ছত্রধারিণী আসিয়া কহিল, রাজকন্যা! আমরা স্নান করিতে গিয়া যে দুইজন মুনিকুমার দেখিয়াছিলাম তাঁহাদের এক জন দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। বলিলেন, অক্ষমালা লইতে আসিয়াছি।

আমি ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, শীঘ্র সঙ্গে করিয়া এইখানে লইয়া আইস।

দেখিলাম পুণ্ডরীকের সখা সেই ঋষিতনয় কপিঞ্জল আসিয়া উপস্থিত। আসনে উপবেশন করিয়া তিনি কহিলেন—রাজপুত্রি! সরোবর হইতে উঠিয়া তুমি বাটী আসিলে পর আমার বন্ধু সরোবরের তীরে নিভৃত এক লতাগহনের অভ্যন্তরে শিলাতলে বসিয়া

বামকরে বামগণ্ড স্থাপনপূর্ব্বক সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িলেন—দুই চক্ষু মুদ্রিত, শরীর স্পন্দরহিত, কান্তিশূন্য ও পাণ্ডুবর্ণ। আমি তখন ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত সরোবরের সরস মৃণাল, শীতল কমলিনীদল ও স্নিগ্ধ শৈবাল তুলিয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলাম এবং তথায় শয়ন করাইয়া কদলীপত্র দ্বারা বীজন করিতে লাগিলাম। কিঞ্চিৎকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিলে বন্ধুর সঙ্গে দুই চারিটী কথা কহিয়া তাঁহাকে না জানাইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি।

কপিঞ্জলের কথা শেষ হইতেই দ্বারী আসিয়া কহিল, রাজকন্যা! তোমার শরীর অসুস্থ হইয়াছে শুনিয়া মহাদেবী তোমাকে দেখিতে আসিতেছেন।

কপিঞ্জল তখন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক "যাহা কর্ত্তব্য হয় করিও", এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দিন কাটিয়া রাত আসিয়া উপস্থিত হইলে তরলিকাকে কহিলাম—চল, আর অপেক্ষা করা বিধেয় নয়। একবার সেই তাপসকুমার পুণ্ডরীকের নিকট গমন করি। এই বলিয়া তরলিকার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রাসাদের শিখরদেশ হইতে অবতরণ করিলাম—প্রমোদবনের নিকটে যে দ্বার ছিল তাহা উদ্‌ঘাটন করিয়া পথে নির্গত হইলাম। সরোবরের নিকটবর্ত্তী হইয়া কৈলাসপর্ব্বতের প্রস্রবনে চরণ ধৌত করিতেছিলাম এমন সময় সরোবরের পশ্চিম তীরে কপিঞ্জলের রোদনধ্বনি শ্রবণ গোচর হইল। ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে সেইদিকে দৌড়াইতে লাগিলাম। পদে পদে পদস্খলন হইতে লাগিল, তথাপি গতির প্রতিরোধ জন্মিল না। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পুণ্ডরীক শৈবাল শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। কমল কুমুদ প্রভৃতি নানাবিধ কুসুম শয্যার পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, শরীর নিস্পন্দ। কপিঞ্জল তাঁহার কণ্ঠ ধারণ করিয়া রোদন করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া

দ্বিগুণ শোকাবেগ হইল—উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার রোদন শ্রবণ করিতে করিতে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। অনেক ক্ষণ পরে চেতনা লাভ করিয়া কহিলাম—সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া যাঁহার আশ্রয় লইতে আসিয়াছি সেই প্রাণেশ্বর কোথায়? অয়ি বনদেবতা! করুণা প্রকাশ করিয়া জীবন দান কর। একাবলী মালার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁহাকে আমার হৃদয় দান করি—একথা কেবল তুমিই জান। তুমিই জান তাঁহাকে আমি গোপনে আপন মনে পতিত্বে বরণ করি।

এই বলিয়া কপিঞ্জলের চরণ ও তরলিকার কণ্ঠ ধারণপূর্ব্বক দীন নয়নে রোদন করিতে লাগিলাম। শোকের প্রথম প্রবল বেগ প্রশমিত হইলে তরলিকাকে কহিলাম—শীঘ্র কাষ্ঠ আহরণ কর, চিতা সাজাইয়া দাও, অগ্নিতে দগ্ধ হইব। স্বামীর সহিত স্বর্গে মিলন ঘটিবে।

আমার কথার অবসানে দেখিলাম প্রকাণ্ড এক মহাপুরুষ চন্দ্রমণ্ডল হইতে গগনমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার পরিধানে ছিল পবনের মত তরল শুভ্র বসন, কর্ণে ছিল স্বর্ণকুণ্ডল, বক্ষঃস্থলে ছিল মুক্তার হার,—তারকার ন্যায় উজ্জ্বল, হস্তে ছিল বাজু। শরীরে ছিল সৌরভ—চতুর্দ্দিক মুগ্ধ করা। দেহপ্রভায় আকাশ আলো করিয়া ভূতলে পদার্পণ করিলেন। চারিদিকে অমৃত-বৃষ্টি হইতে লাগিল। স্থূল বাহু দ্বারা প্রিয়তমের মৃতদেহ আকর্ষণ করিয়া গগনমার্গে উঠিয়া গেলেন—যাইবার মুখে বলিয়া গেলেন, বৎসে মহাশ্বেতা! প্রাণত্যাগ করিও না, পুণ্ডরীকের সহিত আবার তোমার মিলন ঘটিবে।

আকস্মিক এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিয়া কপিঞ্জলকে ইহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলাম। কপিঞ্জল আমার কথায় কিছুই উত্তর না দিয়া "রে দুরাত্মা! বন্ধুকে লইয়া কোথায় যাইতেছিস" রোষ প্রকাশপূর্ব্বক এই কথা কহিতে কহিতে মহাপুরুষের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। আমি

উন্মুখী হইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা তারাগণের মধ্যে মিশাইয়া গেলেন। তখন আমি তরলিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তরলিকা। তুমি ইহার কিছু মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছ? তরলিকা উত্তর দিল—না, এ অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমার বোধ হয় ঐ মহাপুরুষ মানুষ নহেন। যাহা বলিয়া গেলেন তাহাও মিথ্যা হইবে না। যাহা হউক, এক্ষণে চিতারোহণের চেষ্টা হইতে পরাঙ্মুখ হও। অন্ততঃ কপিঞ্জলের আগমনকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা কর। তাঁহার মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যাহা কর্ত্তব্য পরে করিও।

তরলিকার বাক্যই যুক্তিযুক্ত স্থির করিয়া সেই রাত্রি সেই সরোবর তীরেই অতিবাহিত করিলাম। পরদিন প্রভাতে মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় প্রিয়তমের সেই কমণ্ডলু সেই অক্ষমালা গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অবিচলিত ভক্তি সহকারে এই অনাথনাথ ত্রৈলোক্য-নাথের শরণাপন্ন হইলাম। তদবধি এই গিরিগুহায় বাস করি, ঐ সরোবরে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করি, প্রতিদিন এই দেবাদিদেব মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া থাকি। তরলিকা ভিন্ন আর কেহ আমার নিকটে নাই।

এই বলিয়া বাষ্পাকুল নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন।

মহাশ্বেতার বিনয়, দাক্ষিণ্য. সুশীলতা দেখিয়া মোহিত হইয়া চন্দ্রাপীড় তাঁহাকে প্রথমেই স্ত্রীরত্ন বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন। তাহাতে আবার আদ্যোপান্ত আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনা দ্বারা সরলতা প্রকাশ ও পতিব্রতাধর্ম্মের চমৎকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাতে বিধাতার অলৌকিক সৃষ্টি বলিয়া বোধ হইল। মহাশ্বেতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কহিলেন—আপনি মহা-পুরুষ কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়াছেন, তিনি যে মিথ্যা কথা দ্বারা প্রতারণা করিবেন এমন বোধ হয় না। চিন্তা করিবেন না, শীঘ্রই আপনার কামনা পূর্ণ হইবে। মরিলে পুনর্ব্বার জীবিত হয়, একথা নিতান্ত অসম্ভব নয়।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভদ্রে! আপনার পরিচারিকা তরলিকা এক্ষণে কোথায়?

মহাশ্বেতা কহিলেন মহাভাগ! অপ্সরাদিগের এক কুল অমৃত হইতে সমুদ্ভূত হয়, আপনি বোধহয় অবগত আছেন। সেই কুলে মদিরা নামে এক কন্যা জন্মে। গন্ধর্ব্বের অধিপতি চিত্ররথ তাঁহার পাণি গ্রহণ করেন। কালক্রমে মদিরা এক কন্যা প্রসব করেন। কন্যার নাম কাদম্বরী। কাদম্বরী নির্ম্মল শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। শৈশব অবধি একত্র শয়ন একত্র অশন একত্র অবস্থানহেতু আমি কাদম্বরীর স্নেহপাত্রী হইয়া উঠিলাম। সর্ব্বত্র একত্র ক্রীড়া-কৌতুক করিতাম, এক শিক্ষকের নিকট গীত-বাদ্য ও বিদ্যা শিক্ষা হইত। এক শরীরের মত দুইজনে একত্র বাস করিতাম। ক্রমে এরূপ অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ জন্মিল যে আমি তাঁহাকে সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করিতাম, তিনিও আমাকে আপন হৃদয়ের ন্যায় ভাবিতেন। এক্ষণে আমার এই দুরবস্থা শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যাবৎ মহাশ্বেতা এই অবস্থায় থাকিবেন, তাবৎ আমি বিবাহ করিব না। যদি পিতামাতা অথবা বন্ধুবর্গ বলপূর্ব্বক বিবাহ দেন তাহা হইলে অনশনে অথবা হুতাশনে প্রাণ ত্যাগ করিব।

রাজা চিত্ররথ ও মহিষী মদিরা কন্যার এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। এক অপত্য, অত্যন্ত ভালবাসেন, সুতরাং তাঁহার প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে কোন কথা উত্থাপন করিতে পারেন নাই। যুক্তি করিয়া অদ্য প্রভাতে একদাসীকে আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাহার দ্বারা আমাকে বলিয়া পাঠান—বৎসে মহাশ্বেতা! তোমা ব্যতিরেকে কেহ কাদম্বরীকে সান্ত্বনা করিতে সমর্থ নয়, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।

আমি তরলিকাকে সেই দাসীর সহিত কাদম্বরীর নিকট পাঠাইয়াছি। বলিয়া দিয়াছি—সখি! তোমার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। গুরুজনের অনুরোধ কদাচ উল্লঙ্ঘন করিও না।

তরলিকাও তথায় গেল, আপনিও এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহাশ্বেতার কথা যখন শেষ হইল তখন রজনী উপস্থিত। শীতল শিলাতলে পল্লবের শয্যা পাতিয়া মহাশ্বেতা নিদ্রা গেলেন। চন্দ্রাপীড় তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া আপনিও শয়ন করিলেন। প্রভাত হইলে মহাশ্বেতা জপ করিতে আরম্ভ করিলেন এমন সময় তরলিকা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল—সঙ্গে এক গন্ধর্ব্ব পুত্র, নাম কেয়ূরক। স্থূল তার বাহু, বিশাল তার বক্ষ, করে তার তরবারি।

জপ সমাপ্ত হইলে মহাশ্বেতা তরলিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তরলিকা! প্রিয়সখী কাদম্বরীর কুশল? তরলিকা কহিল—হাঁ, কাদম্বরী কুশলে আছেন, আপনার উপদেশ বাক্য শুনিয়া রোদন করিতে করিতে কত কথা কহিলেন। এই কেয়ূরকের মুখে সমুদয় শ্রবণ করুন—

কেয়ূরক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল—কাদম্বরী প্রণয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সাদর সম্ভাষণে আপনাকে কহিলেন, "প্রিয়সখি! আমি তো তোমার দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া আছি। এ সময়ে কিরূপে বিবাহের আড়ম্বর করিয়া আমোদ-প্রমোদ করিব। এ সময় আমোদের সময় নয় বলিয়াই সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। মানুষের তো কথাই নাই, পশু পক্ষীরাও সহচরের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে। এক্ষণে যাহাতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না হয়, এরূপ করিও।" এই বলিয়া কেয়ূরক ক্ষান্ত হইল।

কেয়ূরকের কথা শুনিয়া মহাশ্বেতা কহিলেন, কেয়ূরক! তুমি বিদায় হও, আমি স্বয়ং কাদম্বরীর নিকট যাইতেছি।

কেয়ূরক বিদায় হইলে চন্দ্রাপীড়কে কহিলেন, রাজকুমার! হেমকূট অতি রমণীয় স্থান, চিত্ররথের রাজধানী অতি আশ্চর্য্য, কাদম্বরীর স্বভাব অতি উদার। যদি দেখিতে কৌতুক হয় ও আর কোন কার্য্য না থাকে

তবে আমার সঙ্গে চলুন। অদ্য তথায় বিশ্রাম করিয়া কল্য প্রত্যাগমন করিবেন।

চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতার কথামত গন্ধর্ব্বনগরে চলিলেন। নগরে উত্তীর্ণ হইয়া রাজভবন অতিক্রম করিয়া ক্রমে কাদম্বরী-ভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। দ্বারীরা পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। পথটি কুসুমরেণুপাতে গোলাপ বর্ণ, আম্রফলের রস বর্ষণে সিক্ত। সপ্ত কাঞ্চন তোরণ উত্তীর্ণ হইয়া রাজকুমার অন্তঃপুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন সে স্থান অসংখ্য কুমারীতে পরিপূর্ণ। কেহ লবলীলতার আলবাল রচনা করিতেছে, কেহ রত্নবালুকা ছড়াইতেছে, কেহ অন্ধকার তমালবীথিকায় মণি-প্রদীপ জ্বালাইয়া দিতেছে, কেহ পক্ষী হইতে রক্ষার জন্য দাড়িম্বফল মুক্তাজালে ঢাকিতেছে, কেহ ভবন হংসকে কমল মধুরস পান করাইতেছে, কেহ কুসুমালঙ্কার রচনা করিতেছে, কেহ পক্ষী পড়াইতেছে, কেহ সঙ্গীত করিতেছে। তাহাদিগের বেণু-বীণা-ঝঙ্কার মিলিত মধুর সঙ্গীত শ্রবণে তাঁহার অন্তঃকরণ আনন্দে পুলকিত হইল। ক্রমে কাদম্বরীর বাস গৃহের নিকটবর্ত্তী হইলেন। গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কন্যাজনেরা নানা বাদ্যযন্ত্র লইয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছে। মধ্যে সুচারু পর্য্যঙ্কে কাদম্বরী শয়ন করিয়া আছেন। চামরধারিণীরা অনবরত চামর বীজন করিতেছে।

পরম সুন্দরী কাদম্বরীকে দেখিয়া চন্দ্রাপীড় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন আহা! আজি কি রমণীয় রত্ন দেখিলাম। এরূপ সুন্দরী কুমারী তো কখন দৃষ্টি গোচর হয় নাই।

এদিকে কাদম্বরীর চোখ রাজকুমারের উপর পড়ায় কাদম্বরী মনে মনে কহিলেন, কেয়ূরক যে অপরিচিত যুবা পুরুষের কথা কহিতেছিল, বোধ হয় ইনিই সেই ব্যক্তি। আহা! এরূপ সুন্দর তো কখনও দেখি নাই।

প্রথম দৃষ্টিতেই চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরী উভয়েই জানিলেন—মনে মনে তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল।

বহুকালের পর মহাশ্বেতাকে দেখিয়া কাদম্বরী অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। সহসা গাত্রোত্থান করিয়া সস্নেহে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। মহাশ্বেতাও প্রত্যালিঙ্গন করিয়া কহিলেন, সখি! ইনি ভারতবর্ষের অধিপতি মহারাজ তারাপীড়ের পুত্র, নাম চন্দ্রাপীড়। দিগ্বিজয় বেশে আমাদের দেশে উপস্থিত হইয়াছেন।

মহাশ্বেতা এইরূপে পরিচয় দিতেছেন এমন সময় এক দাসী আসিয়া বলিল, মহাশ্বেতা! রাজা চিত্ররথ ও মহিষী মদিরা আপনাকে আহ্বান করিতেছেন। মহাশ্বেতা, চিত্ররথ ও মদিরার নিকট যাইবার সময় কাদম্বরীকে বলিয়া গেলেন, তোমার ক্রীড়া পর্ব্বতের উপত্যকার মণিমন্দিরে গিয়া চন্দ্রাপীড় অবস্থিতি করুন।

কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়কে তথায় যাইতে অনুরোধ করিয়া সঙ্গে বীণাবাদীকা ও গায়িকা পাঠাইয়া দিলেন। অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিল কেয়ূরক।

চন্দ্রাপীড় মণিমন্দিরে স্নান-ভোজন সম্পন্ন করিয়া মরকতশিলাতলে বসিয়া আছেন এমন সময় কাদম্বরীর প্রধান পরিচারিকা মদলেখা আসিতেছে দেখিলেন। সঙ্গে ছিল তমালিকা, তরলিকা ও অন্যান্য পরিজন। কাহারও করে মালতী মালা, কাহারও করে শ্বেত রেসমী বস্ত্র। একজনের করে এক ছড়া মুক্তার হার। খুব উজ্জ্বল। চারিদিক তার আলোতে আলোকময় হইয়াছে।

মদলেখা নিকটবর্ত্তী হইলে চন্দ্রাপীড় যথোচিত সমাদর করিলেন।

মদলেখা, রাজকুমারের হস্তে বস্ত্র দিয়া, কণ্ঠে মাল্য দিয়া কহিল—রাজকুমার! কাদম্বরী এই হার প্রেরণ করিয়াছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করুন। দেবগণ ও অসুরগণ সাগরের অভ্যন্তর হইতে সমস্ত রত্ন

গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেবল ইহাই শেষ ছিল। এই নিমিত্ত এই হারের নাম শেষ। এই হার রত্নাকর দেন বরুণকে, বরুণ দেন চিত্ররথকে, চিত্ররথ দেন কাদম্বরীকে।

এই বলিয়া মদলেখা চন্দ্রাপীড়ের কণ্ঠদেশে হার পরাইয়া দিল।

চন্দ্রাপীড় কহিলেন, তোমাদিগের গুণে অতিশয় বশীভূত হইয়াছি। কাদম্বরীর প্রসাদ বলিয়া হার গ্রহণ করিলাম।

চন্দ্রাপীড় পরদিন প্রভাতে মহাশ্বেতা ও কাদম্বরীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়ের সময় কাদম্বরীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমাকে একজন পরিজন বলিয়া স্মরণ করিও।

কেয়ূরক তখন ইন্দ্রায়ুধকে লইয়া আসিল। চন্দ্রাপীড় অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। কাদম্বরী কয়েকজন গন্ধর্ব্ব কুমারকে সঙ্গে দিয়া দিলেন।

রাজকুমারকে শিবিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শিবিরের লোক জনেরা সকলেই অতিশয় আহ্লাদিত হইল। চন্দ্রাপীড়, গন্ধর্ব্বলোকের ঐশ্বর্য্য, কাদম্বরীর সৌন্দর্য্য বৈশম্পায়ন ও পত্রলেখার সাক্ষাতে বর্ণনা করিলেন।

পরদিন প্রভাতে শিবিরে বসিয়া আছেন এমন সময় কেয়ূরক আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল—রাজকুমার! আপনি শেষ নামক হার শয্যায় বিস্মৃত হইয়া ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, কাদম্বরীর আজ্ঞায় সেই হার লইয়া উপস্থিত হইয়াছি, গ্রহণ করুন।

হার পাইয়া রাজকুমার আনন্দিত হইয়া কাদম্বরীর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। কেয়ূরক কহিল—কাদম্বরীর সকল কুশল। আপনি পুনরায় গন্ধর্ব্বদেশে গমন করেন, এই তাঁর একান্ত অনুরোধ।

চন্দ্রাপীড় বৈশম্পায়নকে শিবিরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া পত্রলেখার সহিত ইন্দ্রায়ুধে আরোহণ পূর্ব্বক গন্ধর্ব্ব নগরে চলিলেন। কাদম্বরীর বাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ঘোটক হইতে অবতরণ

করিয়া কাদম্বরীর গৃহে প্রবেশ করিলে পর কেয়ূরক পত্রলেখার পরিচয় দিল —ইনি রাজকুমারের পাণের কৌটা-বাটা ধারী পরম প্রীতি পাত্রী। নাম পত্রলেখা।

পত্রলেখা তখন বিনীত ভাবে মহাশ্বেতা ও কাদম্বরীকে প্রণাম করিল।

নানাবিধ কথা প্রসঙ্গে ক্ষণকাল ক্ষেপণ করিয়া চন্দ্রাপীড় আপন শিবিরে ফিরিয়া গেলেন। কাদম্বরীর অনুরোধে পত্রলেখা তথায় রহিল।

চন্দ্রাপীড় শিবিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন উজ্জয়িনী হইতে এক দূত আগত। প্রীতি বিস্ফারিত লোচনে পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধব, প্রজা পরিজন প্রভৃতি সকলের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। দূত প্রণতি পূর্ব্বক তারাপীড়ের একখানি পত্র চন্দ্রাপীড়ের হস্তে প্রদান করিল। যুবরাজ পিতার পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন;—বহু দিবস হইল তুমি ও তোমার বন্ধু বৈশম্পায়ন বাটী হইতে গমন করিয়াছ। অনেক কাল তোমাদিগকে না দেখিয়া আমরা অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি। পত্র পাঠ মাত্র উজ্জয়িনীতে না পৌছিলে আমাদিগের উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

চন্দ্রাপীড় পত্র পাঠ করিয়া বলাহকের পুত্র মেঘনাদকে ডাকিয়া কহিলেন—মেঘনাদ! পত্র লেখাকে সঙ্গে করিয়া কেয়ূরক এই স্থানে আসিবে। তুমি দুই একদিন বিলম্ব কর, পত্রলেখা আসিলে তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাটী যাইবে এবং কেয়ূরককে কহিবে যে, আমাকে ত্বরায় বাটী যাইতে হইল—এজন্য কাদম্বরী ও মহাশ্বেতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না।

মেঘনাদকে এই কথা বলিয়া বৈশম্পায়নকে কহিলেন, আমি অগ্রসর হইলাম; তুমি রীতি পূর্ব্বক শিবির লইয়া আইস।

রাজকুমার দূতকে উজ্জয়িনীর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই নগরে পৌছিলে নগর আনন্দে পূর্ণ হইয়া

উঠিল। তারাপীড় পুত্রকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। প্রণত চন্দ্রাপীড়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার শরীর শীতল হইল। যুবরাজ পিতার নিকট হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া জননীকে প্রণাম করিলেন। পরে অমাত্যের ভবনে গমন করিয়া শুকনাস ও মনোরমার চরণ বন্দনা পূর্ব্বক, বৈশম্পায়ন পশ্চাৎ আসিতেছেন সংবাদ দিয়া তাঁহাদিগকে আহ্লাদিত করিলেন। কিছু দিন পরে মেঘনাদ ও পত্রলেখা আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবরাজ অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া পত্রলেখাকে মহাশ্বেতা ও কাদম্বরীর কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। পত্রলেখা কহিল, সকলেই কুশলে আছেন।

উত্তর ভাগ।

পত্রলেখার পৌঁছিবার পর কয়েক দিন গত হইলে একদা শিপ্রানদীর তীরে চন্দ্রাপীড় ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময় দেখিলেন অতি দূরে কতকগুলি অশ্বারোহী আসিতেছে। তাহারা নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিলেন, অগ্রে কেয়ূরক পশ্চাতে কতিপয় গন্ধর্ব্ব পুত্র। রাজকুমার কেয়ূরককে অবলোকন করিয়া পুলকিত হইলেন এবং সাদর সম্ভাষণে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। কেয়ূরক কহিল—মেঘনাদের নিকট পত্রলেখাকে রাখিয়া গন্ধর্ব্ব নগরে গমন করিয়া দেখি কাদম্বরী মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া আছেন। তাঁহার সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি।

চন্দ্রাপীড় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন—এক্ষণে কি করি, কি উপায়ে কাদম্বরীর প্রাণ রক্ষা হয়। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দিবাবসান হইল।

পরদিন প্রভাতে মেঘনাদকে ডাকাইয়া কহিলেন—মেঘনাদ! পূর্ব্বে তোমাকে যে স্থানে রাখিয়া আসিয়াছিলাম, পত্রলেখা ও কেয়ূরককে সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার তথায় যাও। শুনিলাম বৈশম্পায়ন আসিতেছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমিও তথায় যাইতেছি।

পত্রলেখা মেঘনাদ ও কেয়ূরক বিদায় হইলে পর বৈশম্পায়নের আগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া চন্দ্রাপীড় স্বয়ং শিবিরে যাইবেন স্থির করিয়া মহারাজের আদেশ লইতে গেলেন। রাজা প্রণত পুত্রকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া গাত্রে হস্তস্পর্শ পূর্ব্বক শুকনাসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন অমাত্য! চন্দ্রাপীড় এখন বড় হইয়াছেন, মহিষীর সহিত পরামর্শ করিয়া উপযুক্ত কন্যার অন্বেষণ কর। মন্ত্রী কহিলেন—মহারাজ! এ অতি উত্তম কথা। রাজকুমার সমুদয় বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন, উত্তম রূপে রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করিতেছেন। এক্ষণে বিবাহ করেন ইহা সকলেরই ইচ্ছা।

চন্দ্রাপীড় শিবিরে যাইবার আদেশ প্রার্থনা করিলে রাজা সম্মত হইলেন। চন্দ্রাপীড় তখন দ্রুতবেগে রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলেন। এবং শীঘ্র শিবির যে স্থলে সন্নিবেশিত ছিল সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কাতরস্বরে তাবৎ সৈনিক পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বৈশম্পায়ন কোথায়?

সৈনিক পুরুষেরা কহিলেন—বৈশম্পায়ন কোথায় আছেন, কি নিমিত্ত আসিলেন না সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—

আপনি বৈশম্পায়নকে শিবির লইয়া আসিবার ভার দিয়া প্রস্থান করিলে পর তিনি কহিলেন, পুরাণে শুনিয়াছি অচ্ছোদ সরোবর অতি

পবিত্র তীর্থ। অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও লোকে তীর্থ দর্শন করিতে যায়। আমরা সেই তীর্থের নিকটে আসিয়াছি, অতএব একবার না দেখিয়া এখান হইতে যাওয়া উচিত নয়। অচ্ছোদসরোবরে স্নান করিয়া এবং তীরস্থিত ভগবান্ শশাঙ্কশেখরকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া যাত্রা করা যাইবে। এই বলিয়া সেই সরোবর দেখিতে গেলেন। তীরে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক এক মনোরম লতামণ্ডপ দেখিলেন। ঐ লতা মণ্ডপের অভ্যন্তরে এক শিলা পতিত ছিল। তিনি নিমেষশূন্য নয়নে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। ক্রমে নিতান্ত উন্মনা হইতে লাগিলেন। পরিশেষে ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া বাম করে বাম গণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আকার দেখিয়া বোধ হইল যেন কোন বিস্মৃত বস্তুর স্মরণ করিতেছেন। যাহা হউক, অধিকক্ষণ এখানে আর থাকা হইবে না, এই স্থির করিয়া কহিলাম, মহাশয়! সরোবর দর্শন হইল। এক্ষণে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অবগাহন করুন। বেলা অধিক হইয়াছে। শিবির সুসজ্জ হইয়া আপনার প্রতীক্ষা করিতেছে। আর বিলম্ব করিবেন না।

তিনি আমাদিগের কথায় কিছুই প্রত্যুত্তর দিলেন না, অনিমেষ নয়নে সেই লতামণ্ডপ দেখিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে রোষ ও অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, আমি এখান হইতে যাইব না। তোমরা শিবির লইয়া চলিয়া যাও। এই লতামণ্ডপ দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইয়াছে, ইন্দ্রিয় বিকল হইয়া আসিতেছে। যাইবার আর সামর্থ্য নাই। যদি তোমরা বলপূর্ব্বক লইয়া যাও, বোধ হয় এখান হইতে যাইতে না যাইতেই আমার প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হইবে।

এই কথা বলিয়া তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং লতাগৃহে, তরুতলে, অচ্ছোদতীরে ও দেবমন্দিরে ভ্রমণ করিয়া কি যেন অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন দিন অতিবাহিত হইল। পরিশেষে

তাঁহার আগমন ও আনয়ন বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া কতিপয় সৈন্য তাঁহার নিকটে রাখিয়া আমরা শিবির লইয়া আসিতেছি।

বন্ধুর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চন্দ্রাপীড় বিস্মিত ও উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। ভাবিলেন যদি বাটীতে না গিয়া এইখান হইতে সুহৃদের অন্বেষণে যাই তাহা হইলে পিতা মাতা শুকনাস ও মনোরমা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া ক্ষিপ্ত প্রায় হইবেন। তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা লইয়া এবং শুকনাস ও মনোরমাকে প্রবোধ বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া বাটী হইতে বন্ধুর অন্বেষণে যাওয়াই কর্ত্তব্য। এই স্থির করিয়া উজ্জয়িনীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। বৈশম্পায়নের বৃত্তান্ত নগরে পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। রাজকুমার রাজবাটীতে আসিয়া দেখেন রাজা বাটীতে নাই। তখন রাজকুমার মন্ত্রীর ভবনে গমন করিলেন, দেখিলেন সকলেই বিষণ্ণ। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পিতার নিকট হইতে অচ্ছোদসরোবরে গমন করিবার অনুমতি গ্রহণ করিলেন। তারপর শুকনাস ও মনোরমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চন্দ্রাপীড় বন্ধুর অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে বর্ষাকাল উপস্থিত। চতুর্দ্দিকে মেঘ, দশদিক অন্ধকার। সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হয় না। দিবা রাত্রির কিছুই বিশেষ রহিল না। ঘনঘটার ঘোরতর গভীর গর্জ্জন ও ক্ষণপ্রভার দুঃসহ প্রভা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে বজ্রাঘাত ও শিলাবৃষ্টি। সরোবর পুষ্করিনী নদ নদী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। চতুর্দ্দিক জলময় ও পথ পঙ্কময়। ময়ূর ও ময়ূরীগণ আহ্লাদে পুলকিত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। কদম্ব মালতী কেতকী কুটজ প্রভৃতি নানাবিধ বিকশিত কুসুমের গন্ধ। কোনদিকে কেকারব, কোন দিকে ভেকরব, গগনে চাতকের কলরব। চতুর্দ্দিকে ঝঞ্ঝাবায়ু ও বৃষ্টিধারার গভীর শব্দ এবং স্থানে স্থানে গিরিনির্ঝরের পতন ধ্বনি। চন্দ্রাপীড় এই ভীষণ দুর্যোগের মধ্য দিয়া অচ্ছোদসরোবরের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিষণ্ণ চিত্তে তরু গহন, তীরভূমি ও লতামণ্ডপ তন্ন তন্ন করিয়া প্রিয় সখার

অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহার অবস্থানের কোন চিহ্ন পাইলেন না তখন ভগ্নোৎসাহ চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন—কোথায় যাই, কোথায় গেলে বন্ধুর দেখা পাই। শরীর অবশ হইতেছে, চরণ আর চলে না। সকলই অন্ধকার দেখিতেছি। একবার ভাবিলেন মহাশ্বেতার আশ্রমে খোঁজ করিয়া আসিলে ক্ষতি কি। তাই অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক তথায় গমন কবিলেন। আশ্রমে পৌছিয়া দেখিলেন মহাশ্বেতা শিলাতলে উপবেশন করিয়া অধোমুখে রোদন করিতেছেন। তরলিকা বিষণ্ণ বদনে ও দুঃখিত মনে তাঁহাকে ধরিয়া আছে। মহাশ্বেতার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া অতিশয় ভীত হইলেন। ভাবিলেন বুঝি কাদম্বরীর কোন বিপদ ঘটিয়া থাকিবে। চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতার নিকটবর্ত্তী হইয়া শিলাতলে এক পার্শ্বে বসিলেন ও তরলিকাকে মহাশ্বেতার শোকের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। তরলিকা কিছু বলিতে পারিল না, কেবল দীন নয়নে মহাশ্বেতার মুখপানে চাহিয়া রহিল। মহাশ্বেতা বসনাঞ্চলে নেত্রজল মোচন করিয়া কাতর স্বরে কহিলেন, রাজকুমাব! যে অভাগিনী পূর্ব্বে আপনাকে দারুণ শোক বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়াছিল সেই অভাগিনী এক্ষণেও এক অপূর্ব্ব ঘটনা শ্রবণ করাইতে প্রস্তুত আছে।

একদা আশ্রমে বসিয়া আছি এমন সময় রাজকুমারের সমবয়স্ক এক ব্রাহ্মণকুমারকে দূর হইতে দেখিলাম। তিনি এরূপ অন্যমনস্ক যে তাঁহার আকার দেখিয়া বোধ হইল যেন, কোনও বস্তুর অন্বেষণ করিতে করিতে এই দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া পরিচিতের ন্যায় আমাকে জ্ঞান করিয়া নিমেষশূন্য নয়নে অনেকক্ষণ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। অনন্তর মৃদুস্বরে বলিলেন, সুন্দরি! তোমার নবীন বয়স, কোমল শরীর, শিরীষ কুসুমেব ন্যায় সুকুমাব অবয়ব—এ সময় তোমার তপস্যার সময় নয়। ব্রাহ্মণকুমারের কথাগুলি অগ্নিশিখার ন্যায় আমার গাত্র দাহ করিতে লাগিল। তাহার কথা সমাপ্তি না হইতেই

বিরক্ত হইয়া তরলিকাকে ডাকিয়া কহিলাম, ঐ দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণকুমারের অসঙ্গত কথা ও কুটিল ভাবভঙ্গী দ্বারা বোধ হইতেছে উহার অভিপ্রায় ভাল নয়। উহাকে বারণ কর যেন আর এখানে না আইসে। যদি আইসে ভাল হইবে না। তরলিকা ভয়প্রদর্শন ও তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক বারণ করিয়া কহিল, তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও, আর আসিও না। সেই হতভাগ্য সেদিন ফিরিয়া গেল বটে কিন্তু আপন সঙ্কল্প একেবারে পরিত্যাগ করিল না। একদা নিশিথে শিলাতলের উপর শয়ন করিয়া চন্দ্রমণ্ডলে দৃষ্টি রাখিয়া পুণ্ডরীকের গুণাবলি স্মরণ করিতেছি, ভাবিতেছি দেববাক্যও বুঝি মিথ্যা হইল। কই! প্রিয়তমের সহিত মিলনের কোনও উপায় দেখিতেছি না, কপিঞ্জল সেই গমন করিয়াছেন অদ্যাপি প্রত্যাগত হইলেন না। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতেছি এমন সময় দূর হইতে পদ সঞ্চারের শব্দ শুনিতে পাইলাম। যে দিকে শব্দ হইতেছিল সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জ্যোৎস্নার আলোকে দূর হইতে দেখিলাম সেই ব্রাহ্মণকুমার উন্মত্তের ন্যায় দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দৌড়াইয়া আসিতেছে। তাহার সেইরূপ ভয়ঙ্কর আকার দেখিয়া সাতিশয় শঙ্কা জন্মিল। ভাবিলাম উন্মত্তটা আসিয়া সহসা যদি গাত্র স্পর্শ করে তৎক্ষণাৎ এই অপবিত্র কলেবর পরিত্যাগ করিব। পুণ্ডরীকের সহিত বুঝি আর মিলন ঘটিল না—এতকাল বৃথা কষ্ট ভোগ করিলাম। এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় পাপিষ্ঠ নিকটে আসিয়া কহিল, চন্দ্রমুখি! আমাকে পতিত্বে বরণ কর। তাহার সেই স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া আমার রোষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ক্রোধে কলেবর কাঁপিতে লাগিল। নিশ্বাস বায়ুর সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক ভৎর্সনা করিয়া কহিলাম, রে দুরাত্মন! এখনও তোর মস্তকে বজ্রাঘাত হইল না? এখনও তোর জিহ্বা ছিন্ন হইয়া পতিত হইল না? এখনও তোর শরীর শত শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল না? মনুষ্য

দেহ আশ্রয় করিয়াছিস্ কিন্তু তোকে পশু পক্ষীর ন্যায় যথেচ্ছাচারী দেখিতেছি। পক্ষী অথবা পশু জাতিতেই তোর পতন হওয়া উচিত। অনন্তর ভগবান্ চন্দ্রমার প্রতি নেত্রপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম, ভগবান্! সর্ব্বসাক্ষি! যদি কায়মনোবাক্যে দেব পুণ্ডরীকের প্রতি ভক্তি থাকে, যদি আমার অন্তঃকরণ পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হয় তাহা হইলে আমার বচন সত্য হউক—পক্ষী অথবা পশু জাতিতে এই পাপিষ্ঠের পতন হউক। আমার কথার অবসানে দেখিলাম সেই ব্রাহ্মণকুমার অচেতন হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তাহার সঙ্গিগণ কাতর স্বরে রোদন করিয়া উঠিল। তাহাদের মুখে শুনিলাম তিনি আপনার মিত্র।

এই বলিয়া লজ্জায় অধোমুখী হইয়া মহাশ্বেতা রোদন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রাপীড় নয়ন নিমীলন পূর্ব্বক মহাশ্বেতার কথা শুনিতে-ছিলেন। কথা সমাপ্ত হইলে কহিলেন, ভগবতি! এজন্মে কাদম্বরীর সঙ্গ লাভ ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। বলিতে বলিতে তিনি চৈতন্য শূন্য হইয়া শিলাতল হইতে ভূতলে পড়িতেছিলেন অমনি তরলিকা মহাশ্বেতাকে ছাড়িয়া শশব্যস্তে হস্ত বাড়াইয়া ধরিল এবং কাতর স্বরে কহিল, স্বামিকন্যা! দেখ দেখ কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত। মৃতদেহের ন্যায় গ্রীবা ভগ্ন হইয়া পড়িতেছে। নেত্র নিমীলিত হইয়াছে। নিশ্বাস বহিতেছে না। জীবনের কোন লক্ষণই নাই। তরলিকা মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিল। মহাশ্বেতা হতবুদ্ধি হইয়া চন্দ্রাপীড়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্থির রহিলেন।

এদিকে পত্রলেখার মুখে চন্দ্রাপীড়ের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়ের আগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া বাটীর বাহির হইয়া পড়িলেন। কাদম্বরীর আজ আর আনন্দ ধরে না—চন্দ্রাপীড়ের সহিত মিলন ঘটিবে। পরিধানে আজ তাঁর সুন্দর বসন-ভূষণ, বিরহ-মলিন বদন আজ তাঁর আনন্দে উজ্জ্বল। চন্দ্রাপীড়ের কথা

চিন্তা করিতে করিতে মহাশ্বেতার আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্রমে পৌছিয়া দেখিলেন, সকলেই বিষণ্ণ। অনন্তর ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া পুষ্পশূন্য উদ্যানের ন্যায় পল্লব শূন্য তরুর ন্যায় বারিশূন্য সরোবরের ন্যায় প্রাণশূন্য চন্দ্রাপীড়ের দেহ পতিত রহিয়াছে, দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র কাদম্বরী দারুণ শোকে ঈষৎ হাস্য করিয়া উঠিলেন, কহিলেন, —মরিবার এমন সময় আর কবে পাইব। আহা! আমার কি সৌভাগ্য, মরিবার সময় প্রাণেশ্বরের দেখা পাইলাম। সুখে মরিবার সময় পাইয়াছি তোমরা কেউ আমায় বাধা দিও না। মদলেখা তখন কাদম্বরীর চরণে পতিত হইয়া আর্ত্তস্বরে কহিল—রাজকন্যা! আহা, তোমা বই মদিরা ও চিত্ররথের আর কেহ নাই! কাদম্বরী কহিলেন যদি আমার প্রতি প্রিয়সখীর স্নেহ থাকে ও আমার প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে শোকে পিতা মাতার যাহাতে দেহ অবসান না হয়, বাসভবন শূন্য দেখিয়া সখীজন ও পরিজনেরা যাহাতে দিগ্দিগন্তে প্রস্থান না করে, এরূপ করিও। সাবধান যেন অশোকতরুর পল্লব কেহ খণ্ডন না করে। কালিন্দী শারিকা শুককে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিও। আমার প্রীতিপাত্র হরিণটিকে কোন তপোবনে রাখিয়া আসিও। বনমানুষী কখন গৃহে বাস করে না, অতএব তাহাকে বনে ছাড়িয়া দিও। নকুলীকে সর্ব্বদা আপন অঙ্কে রাখিও। কোন তপস্বীকে ক্রীড়াপর্ব্বত প্রদান করিও। আমার এই অঙ্গের ভূষণ গ্রহণ কর, ইহা কোন দীন ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিও। বীণা ও অন্য সামগ্রী যাহা তোমার রুচি হয় আপনি রাখিও। আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম, আইস একবার জন্মের শোধ আলিঙ্গন ও কণ্ঠ গ্রহণ করিয়া শরীর শীতল করি। মদলেখাকে এই কথা বলিয়া মহাশ্বেতার কণ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়সখি! জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা, যেন জন্মান্তরে প্রিয়সখীর দেখা পাই। এই বলিয়া চন্দ্রাপীড়ের চরণদ্বয় অঙ্কে ধারণ করিলেন। স্পর্শমাত্র চন্দ্রাপীড়ের দেহ হইতে এক

উজ্জ্বল জ্যোতিঃ উদ্গত হইল। অন্তরীক্ষ হইতে তখন এই বাণী বিনির্গত হইল—"বৎসে মহাশ্বেতা! প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাত হইবে, সন্দেহ করিও না। পুণ্ডরীকের শরীর আমার তেজঃস্পর্শে অবিনাশী ও অবিকৃত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে আছে। চন্দ্রাপীড়ের এই শরীরও তেজোময় ও অবিনাশী। বিশেষতঃ কাদম্বরীর করস্পর্শ হওয়াতে ইহার আর ক্ষয় নাই। শাপদোষে এই দেহ জীবনশূন্য হইয়াছে, যোগিশরীরের ন্যায় পুনর্ব্বার জীবাত্মা সংযুক্ত হইবে। তোমাদের প্রত্যয়ের নিমিত্ত ইহা এই স্থানেই থাকিল। অগ্নি সংস্কার বা পরিত্যাগ করিও না। যতদিন পুনর্জ্জীবিত না হয় যত্নের সহিত রক্ষা করিও।"

আকাশ বাণী শ্রবণান্তর সকলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া নিমেষ শূন্য লোচনে গগনে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। পত্রলেখা উন্মত্তের ন্যায় সহসা গাত্রোত্থান করিয়া ইন্দ্রায়ুধের নিকটে অতিবেগে গমন করিয়া কহিল—রাজকুমার প্রস্থান করিলেন তোমার আর একাকী থাকা উচিত নয়। এই বলিয়া রক্ষকের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক বল্গা গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত অচ্ছোদসরোবরে ঝম্প প্রদান করিল। ক্ষণকালের মধ্যে জলে নিমগ্ন হইয়া গেল। অনন্তর জটাধারী এক তাপসকুমার সহসা জলমধ্য হইতে সমুত্থিত হইলেন। তাঁহার মস্তকে শৈবাল লাগাতে ও গাত্র হইতে বিন্দু বিন্দু বারি পতিত হওয়াতে প্রথমে বোধ হইল, যেন জলমানুষ। মহাশ্বেতারই নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—গন্ধর্ব্বরাজপুত্রি! আমাকে চিনিতে পার? মহাশ্বেতা শোক, বিস্ময় ও আনন্দের সহিত গাত্রোত্থান করিয়া প্রণিপাত করিলেন। গদগদ বচনে কহিলেন, ভগবান্ কপিঞ্জল! এতকাল কোথায় ছিলেন? আপনার প্রিয়সখাকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছেন? কপিঞ্জল উত্তর করিলেন, গন্ধর্ব্বরাজপুত্রি! মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর—তুমি সেইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে-ছিলে, তোমাকে একাকী রাখিয়া "রে দুরাত্ম! বন্ধুকে লইয়া কোথায়

যাইতেছিস্" এই কথা বলিতে বলিতে অপহরণকারী সেই পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। তিনি আমার কথায় কিছুই উত্তর না দিয়া স্বর্গমার্গে উপস্থিত হইলেন। আকাশবিহারীগণ বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে দেখিতে লাগিল। স্বর্গীয় নারীরা ভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল। আমি ক্রমাগত পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। তিনি চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেন। তথায় মণি-নির্ম্মিত এক পর্য্যঙ্কে প্রিয়সখার শরীর স্থাপন করিয়া কহিলেন, কপিঞ্জল! আমি চন্দ্রমা, জগতের হিতের নিমিত্ত গগনে উদিত হইয়া স্বকার্য্য সম্পাদন করিতেছিলাম। তোমার এই প্রিয় সুহৃদ্ বিরহ বেদনায় প্রাণত্যাগ করিবার সময় বিনাপরাধে আমাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, "রে দুরাত্মা! তোর কিরণে পাগল করিয়া আমার প্রাণ বিনাশ করিলি, এই অপরাধে তোকে এই ভূতলে বারংবার জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে এবং আমার ন্যায় দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।"

বিনাপরাধে শাপ দেওয়ায় আমি ক্রোধান্ধ হইলাম। এবং এই বলিয়া প্রতিশাপ প্রদান করিলাম, "রে মূঢ়! তুই এবার যেরূপ যাতনা ভোগ করিলি, বারংবার তোকে এইরূপ যাতনা ভোগ করিতে হইবে। ক্রোধ শান্তি হইলে ধ্যান করিয়া দেখিলাম আমার কিরণ হইতে অপ্সরা-দিগের যে কুল উৎপন্ন হয়, সেই কুলে গৌরী নামে এক কুমারী জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার দুহিতা মহাশ্বেতা এই মুনিকুমারকে পতিরূপে বরণ করিয়াছে। তখন অতিশয় অনুতাপ হইল। কিন্তু শাপ দিয়াছি আর উপায় কি? এক্ষণে উভয়ের পাপে উভয়কেই মর্ত্ত্যলোকে দুইবার জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। যতদিন শাপের অবসান না হয়, ততদিন তোমার বন্ধুর মৃতদেহ এই স্থানে থাকিবে। আমার সুধাময় করস্পর্শে ইহা বিকৃত হইবে না। শাপাবসানে এই শরীরেই পুনর্ব্বার প্রাণ সঞ্চার হইবে, এই নিমিত্ত ইহা এখানে আনিয়াছি। মহাশ্বেতাকেও আশ্বাস প্রদান করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে তুমি মহর্ষি শ্বেতকেতুর নিকট

গমন করিয়া বিশেষরূপে এই সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। তিনি মহাশক্তিশালী, অবশ্য কোন প্রতিকার করিতে পারিবেন। চন্দ্রমার কথায় আমি দেবমার্গ দিয়া শ্বেতকেতুর নিকট গমন করিতেছিলাম। পথিমধ্যে অতি কোপন স্বভাব এক বিমানচারীকে উল্লঙ্ঘন করাতে তিনি ভ্রূকুটীভঙ্গী দ্বারা রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক আমার প্রতি নেত্রপাত করিয়া কহিলেন—"রে দুরাত্মা! তুই মিথ্যা তপোবলে গর্ব্বিত হইয়াছিস্। তুরঙ্গের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া আমায় উল্লঙ্ঘন করিলি, অতএব তুরঙ্গ হইয়া ভূতলে জন্ম গ্রহণ কর্।" আমি বাষ্পাকুল নয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে নানা অনুনয় করিয়া কহিলাম, ভগবান্! সখার বিরহ শোকে অন্ধ হইয়া এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, অবজ্ঞা প্রযুক্ত করি নাই—ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। প্রসন্ন হইয়া শাপ সংহার করুন। তিনি কহিলেন, আমার শাপ অন্যথা হইবার নহে। তুমি ভূতলে তুরঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া যাহার বাহন হইবে, তাহার মরণান্তে স্নান করিয়া আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। আমি বিনয় পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলাম ভগবান্! শাপদোষে চন্দ্রমা মর্ত্তলোকে জন্ম গ্রহণ করিবেন। আমি যেন তাঁহারই বাহন হই। তিনি ধ্যান প্রভাবে সমুদয় অবগত হইয়া কহিলেন, "হাঁ, উজ্জয়িনী নগরে তারাপীড় রাজা অপত্য প্রাপ্তির আশায় ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন। চন্দ্রমা তাঁহারই অপত্য হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন। তোমার প্রিয় বন্ধু পুণ্ডরীক ঋষিও রাজমন্ত্রী শুকনাসের অপত্যরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। তুমিও রাজকুমাররূপে অবতীর্ণ চন্দ্রের বাহন হইবে।" তাঁহার কথার অবসানে আমি সমুদ্রের প্রবাহে নিপতিত হইলাম এবং তুরঙ্গম রূপ ধারণ করিয়া তীরে উঠিলাম। চন্দ্রাপীড় চন্দ্রের অবতার। যিনি তোমার শাপে বিনষ্ট হইয়াছেন, তিনি আমার সখা পুণ্ডরীকের অবতার।

কাদম্বরী তখন জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবান্! পত্রলেখাও ইন্দ্রায়ুধের সহিত জলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ইন্দ্রায়ুধরূপ পরিত্যাগ করিয়া আপনি

স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু পত্রলেখা কোথায় গেল, শুনিতে অতিশয় কৌতুক জন্মিয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া ব্যক্ত করুন। কপিঞ্জল কহিলেন জলের মধ্যে প্রবেশ করিবার পর যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা আমি অবগত নহি। চন্দ্রের অবতার চন্দ্রাপীড় ও পুণ্ডরীকের অবতার বৈশম্পায়ন কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং পত্রলেখা কোথায় গিয়াছে,জানিবার জন্য কালত্রয়দর্শী ভগবান্ শ্বেতকেতুর নিকট গমন করি।

এই বলিয়া কপিঞ্জল গগনমার্গে উঠিয়া গেলেন। তিনি প্রস্থান করিলে রাজপরিজনেরা বিস্ময়ে শোক সন্তাপ বিস্মৃত হইল। চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়নের পুনরুজ্জীবন পর্য্যন্ত এইস্থানে থাকিতে হইবে স্থির করিয়া বাসস্থান নিরূপণ করিল। মদলেখা ও তরলিকা ধরাধরি করিয়া সূর্য্যের তাপ ও বৃষ্টির জল না লাগে এমন স্থানে, এক শিলার উপরে চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহ আনিয়া রাখিল। সরোবরে স্নান করিয়া কাদম্বরী শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিলেন।

তখন বর্ষাকাল। চতুর্দ্দিকে মেঘ, মুষলধারে বৃষ্টি, ক্ষণে ক্ষণে বজ্রের ধ্বনি, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের দুঃসহ আলোক। গিরি-নির্ঝরের পতন শব্দ। চারিদিকে অন্ধকার—রজনী গভীর, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কি ভয়ঙ্কর সময়। এ সময়ে সাহসী পুরুষের মনেও ভয়ের সঞ্চার হয়। কিন্তু কাদম্বরী সেই ভীষণ অরণ্যে প্রিয়তমের পাদপদ্ম অঙ্কে ধারণ করিয়া সেই বিকট বিভাবরী যাপন করিলেন।

প্রভাতে অরুণ উদিত হইলে প্রিয়তমের শরীরের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছু মাত্র বিশ্রী হয় নাই, বরং অধিক উজ্জ্বল বোধ হইতেছে। তখন আহ্লাদিত চিত্তে মদলেখাকে কহিলেন, মদলেখা! দেখ দেখ, প্রাণেশ্বরের শরীর যেন সজীব বোধ হইতেছে। কপিঞ্জল যে শাপ বিবরণ বর্ণনা করিয়া গেলেন এবং আকাশবাণী দ্বারা যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা সত্য সংশয় নাই। যতদিন জীবননাথের

শরীরে জীবন ফিরিয়া না আসে ততদিন আমাকে এই স্থানে অবস্থান করিতে হইবে। অতএব তুমি বাটী যাও এবং এই বিস্ময়াবহ ব্যাপার পিতা মাতার কর্ণগোচর কর। তাঁহারা যেন দুঃখিত না হন এবং এখানে না আসেন, এরূপ করিও। এখানে আসিলে তাঁহাদিগকে দেখিয়া আমি শোকাবেগ ধারণ করিতে পারিব না।

মদলেখা গন্ধর্ব্ব নগর হইতে প্রত্যাগত হইয়া কহিলেন, রাজকন্যা! তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে। মহারাজ ও মহিষী আদ্যোপান্ত সমুদয় শ্রবণ করিয়া সস্নেহে কহিলেন, "বৎসে কাদম্বরী! স্বাভিলষিত স্বামীকে স্বয়ং বরণ করিয়াছ, তিনি আবার চন্দ্রমার অবতার শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। এক্ষণে আকাশ-বাণীর অনুসারে ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।"

মদলেখার মুখে পিতা মাতার মধুর বাক্য শুনিয়া কাদম্বরীর উদ্বেগ দূর হইল।

ক্রমে বর্ষাকাল কাটিয়া গিয়া শরৎকালের শোভা দেখা দিল—সরোবর নদ নদীর জল টল্-টল্ করিয়া উঠিল, কাশ কুসুম বিকশিত হইল, বিবিধ পুষ্পের গন্ধ লইয়া মন্দ মন্দ সমীরণ বহিতে লাগিল। চাঁদের ধব ধবে জ্যোৎস্নায় পৃথিবী স্নান করিয়া উঠিল। শরৎকালের শোভায় কাদম্বরীর চিত্ত অনেক সুস্থ হইল।

একদা মেঘনাদ আসিয়া কহিল, দেবি! যুবরাজের বিলম্ব হওয়াতে মহারাজ, মহিষী ও মন্ত্রী অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া অনেক দূত পাঠাইয়াছেন। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

কাদম্বরী উত্তরে কহিলেন মেঘনাদ! দূতদিগের সঙ্গে এরূপ একটি বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া দাও যে এই সমুদয় ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং বিশেষরূপে সমুদয় বিবরণ বলিতে পারিবে। কাদম্বরীর কথায় মেঘনাদ ত্বরিতক নামে এক বিশ্বস্ত সেবককে ডাকাইয়া দূতগণের সঙ্গে রাজধানীতে পাঠাইয়া দিল।

একদা মহিষী দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন এমন সময় খবর গেল যুবরাজের সংবাদ আসিয়াছে। শাবক-ভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে চঞ্চল চক্ষু নিক্ষেপ করিয়া গদগদ বচনে কহিলেন তোমরা শীঘ্র চন্দ্রাপীড়ের কুশল সংবাদ বল। আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। চন্দ্রাপীড়কে তোমরা কোথায় দেখিলে ? তাহারা কহিল আমরা অচ্ছোদসরোবর তীরে যুবরাজকে দেখিয়াছি। অন্যান্য সংবাদ এই ত্বরিতক নিবেদন করিতেছে শ্রবণ করুন।

মহিষী তাহাদিগের বিষণ্ণ আকার দেখিয়াই অমঙ্গল সম্ভাবনা করিতেছিলেন, তাহাতে আবার ত্বরিতক আর আর সংবাদ নিবেদন করিতেছে এই কথা শুনিয়া বিষণ্ণ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। শিরে করাঘাত পূর্ব্বক বিলাপ করিয়া কহিলেন ত্বরিতক আর কি বলিবে ? তোমাদিগের বিষণ্ণ বদন, কাতর বচন ও হর্ষ শূন্য আগমনেই সকল ব্যক্ত হইয়াছে। এই বলিয়া মহিষী সংজ্ঞা শূন্য হইলেন।

বিলাসবতী দেব মন্দিরে সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িয়া আছেন শুনিতে পাইয়া মহারাজ শুকনাসের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কেহ কদলী-দল দ্বারা বীজন, কেহ জল সেচন কেহ বা শীতল পাণিতল দ্বারা মহিষীর গাত্র স্পর্শ করিতেছে। ক্রমে মহিষীর চৈতন্যের উদয় হইল এবং মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা প্রবোধ বাক্যে কহিলেন দেবি ! যদি চন্দ্রাপীড়ের কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে, রোদন দ্বারা তাহার কি প্রতিকার হইবে ? বিশেষতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করা হয় নাই। এই বলিয়া ত্বরিতককে ডাকাইলেন। ত্বরিতক আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন ত্বরিতক ! চন্দ্রাপীড় কোথায়, কিরূপ আছেন ? বাটী আসিবার নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছিলাম, আসিলেন না কেন ? কি উত্তর দিয়াছেন ? ত্বরিতক, যুবরাজের বাটী হইতে গমন অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। রাজা আর শুনিতে না পারিয়া আর্ত্তস্বরে বারণ করিয়া

কহিলেন ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও। আর বলিতে হইবে না। হা বৎস! বন্ধুর প্রতি যেরূপে প্রণয় প্রকাশ করিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত স্থল তুমিই। তুমিই সার্থকজন্মা মহাপুরুষ।

মহারাজকে কাতর দেখিয়া ত্বরিতক বিনীত বচনে নিবেদন করিল, মহারাজ! আপনি যেরূপ সম্ভাবনা ও শঙ্কা করিতেছেন সেরূপ নয়। যুবরাজের শরীর প্রাণ বিযুক্ত হইয়াছে সত্য বটে কিন্তু অনির্ব্বচনীয় ঘটনা বশতঃ অবিকৃত আছে। এই বলিয়া আকাশ বাণীর সমুদয় বিবরণ, ইন্দ্রায়ুধের কপিঞ্জল রূপ ধারণ ও শাপ বৃত্তান্ত অবিকল বর্ণনা করিল। উহা শ্রবণ করিয়া রাজার শোক বিস্ময়ে পরিণত হইল। অবাক দৃষ্টিতে তখন শুকনাসের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। শোকে নিমগ্ন হইয়াও শুকনাস ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক পরম জ্ঞানীর ন্যায় রাজাকে কহিলেন মহারাজ! রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমুদয় পুরাণে অনেক প্রকার শাপ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। নহুষ অগস্ত্যের শাপে অজগর হইয়াছিলেন, বশিষ্ট মুনির পুত্রের শাপে সৌদাস রাক্ষস হন। মনুষ্যলোকে দেবতাদিগের উৎপত্তি অলীক বা অসম্ভব নয়। মন্ত্রীর কথা শেষ হইলে চন্দ্রাপীড়ের অবিকৃত অঙ্গ-শোভা অবলোকন করিবার জন্য সকলেই অচ্ছোদসরোবরের তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুজনের আগমনে কাদম্বরী শোকে বিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। চন্দ্রাপীড়ের মৃত দেহ দর্শন করিয়া মহিষী উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাজা বারণ করিয়া কহিলেন দেবি! পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যফলে চন্দ্রাপীড়কে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম বটে কিন্তু ইনি দেবমূর্ত্তি, এ সময়ে স্পর্শ করা উচিত নয়। যাঁহার প্রভাবে বৎস পুনরায় জীবন লাভ করিবে, যিনি এক্ষণে একমাত্র অবলম্বন, তোমার বধূ সেই গন্ধর্ব্বরাজ পুত্রী শোকে অচৈতন্য হইয়াছেন, দেখিতেছ না? যাহাতে ইঁহার জ্ঞানের উদয় হয় তাহার চেষ্টা পাও। কই! বধূ কোথায়? বলিয়া রাণী কাদম্বরীর নিকটে গেলেন এবং ধরিয়া

তুলিয়া ক্রোড়ে বসাইলেন। তাঁহার অশ্রুজল ও পাণিতল স্পর্শে কাদম্বরীর চৈতন্য লাভ হইল। তখন নয়ন মেলিয়া একে একে গুরুজন-দিগকে প্রণাম করিলেন। বৈধব্যদশা শীঘ্র দূর হউক বলিয়া সকলে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা মদলেখাকে ডাকিয়া কহিলেন বৎসে! তুমি বধূর নিকটে গিয়া কহ যে, যেরূপ আচার করিতে হয় এবং এত দিন যেরূপ নিয়মে ছিলেন আমাদের আগমনে যেন তাহার অন্যথা না হয়, বধূ যেন সর্ব্বদা চন্দ্রাপীড়ের নিকটে রহেন। এই বলিয়া সঙ্গিগণের সঙ্গে আশ্রম হইতে বাহির হইলেন। আশ্রমের নিকটে এক লতামণ্ডপে বাসস্থান নিরূপণ করিয়া নৃপতিগণকে ডাকাইয়া কহিলেন—আমার সংসারে প্রবেশ করিতে আস্থা নাই। তোমরা সহোদর তুল্য ও পরম সুহৃদ্। নগরে গমন করিয়া শৃঙ্খলার সহিত রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন কর। আমি পরলোকে পরিত্রাণ পাইবার উপায় চিন্তা করি। ধর্ম্ম সঞ্চয় ব্যতীত উহার আর অন্য পথ নাই। তোমরা এক্ষণে বিদায় হও। এই স্থানেই আমি জীবন শেষ করিব, অভিলাষ করিয়াছি।" এই বলিয়া সকলকে বিদায় করিলেন এবং তপস্বিবেশে জগদীশ্বরের আরাধনায় নিমগ্ন হইলেন।

কথাশেষ।

মহর্ষি জাবালি এইরূপে কথা সমাপ্ত করিয়া হাস্য পূর্ব্বক মুনিকুমার-দিগকে কহিলেন দেখ! আমি অন্যমনস্ক হইয়া তোমাদিগের অভিপ্রেত উপাখ্যান অপেক্ষাও অধিক বলিয়া ফেলিলাম। যাহা হউক যে মুনিতনয় অবিনয় হেতু মর্ত্ত্যলোকে শুকনাসের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তদনন্তর মহাশ্বেতার শাপে পক্ষী জাতিতে পতিত হন, তিনি এই। এই কথা বলিয়া অঙ্গুলি দ্বারা আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার কথাবসানে পূর্ব্বজন্মের সমুদয় কর্ম্ম আমার স্মৃতিপথে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই অবধি মনুষ্যের ন্যায় সুস্পষ্ট কথা কহিতে লাগিলাম। কেবল মনুষ্য দেহ হইল না, কিন্তু চন্দ্রাপীড়ের প্রতি সেইরূপ স্নেহ, মহাশ্বেতার প্রতি সেইরূপ অনুরাগ জন্মিল। পিতা মাতা, মহারাজ তারাপীড়, মহিষী বিলাসবতী সকলের কথা একই সঙ্গে মনে পড়িল। তখন আমার অন্তঃকরণ কিরূপ হইল কিছু বলিতে পারি না। অনেকক্ষণ চিন্তা করিলাম, মনে কত ভাবের উদয় হইতে লাগিল। বিনয় বচনে মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলাম ভগবান্! আমার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া যাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল, সেই চন্দ্রাপীড়ের অদর্শনে আর প্রাণ ধারণ করিতে পারিতেছি না। তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিয়া দিন্। আমি পক্ষী হইয়াছি, তথাপি তাহার সহিত একত্র বাস করিলে আমার কোনও ক্লেশ থাকিবে না। মহর্ষি আমার প্রতি নেত্রপাত করিয়া কহিলেন—অদ্যাপি তোর পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই, অগ্রে গমন করিবার সামর্থ্য হউক পরে তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া দিব।

উপসংহার।

কথায় কথায় নিশা অবসান হইল। পম্পা সরোবরে কলহংসগণ কলরব করিয়া উঠিল। প্রভাত সমীরণ তপোবনের তরুপল্লব কম্পিত করিয়া মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। মহর্ষি হোমবেলা উপস্থিত দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। মুনিকুমারেরা এরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়া কথা শুনিতেছিলেন এবং শুনিয়া এরূপ বিস্ময়াপন্ন হইলেন যে মহর্ষিকে প্রণাম না করিয়াই প্রভাতকৃত্য সম্পাদন করিতে গেলেন। হারীত আমাকে লইয়া আপন পর্ণশালায় রাখিয়া নির্গত হইলেন। তিনি বহির্গত হইলে আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, যে দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর, কোনও কর্ম্মের যোগ্য নহে, এ প্রাণ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ—এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম এমন সময়, হারীত সহাস্য বদনে আমার নিকটে আসিয়া মধুর বচনে কহিলেন ভ্রাতঃ! ভগবান্ শ্বেতকেতুর নিকট হইতে তোমার পূর্ব্ব সুহৃদ্ কপিঞ্জল তোমার অন্বেষণে আসিয়াছেন। আমি অহ্লাদে পুলকিত হইয়া কহিলাম কই, তিনি কোথায়? আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চল। বলিতে বলিতে কপিঞ্জল আমার নিকটে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কহিলাম সখা কপিঞ্জল! ইচ্ছা হইতেছে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করি। বলিবা মাত্র তিনি আপন বক্ষঃস্থলে আমাকে তুলিয়া লইলেন। পরে মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক শ্রান্তিদূর করিয়া কহিলেন—ভগবান্ শ্বেতকেতু দিব্যচক্ষু দ্বারা আমাদিগের সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রতিকারের নিমিত্ত এক ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রিয়ার প্রভাবে আমি ঘোটকরূপ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমাকে বিষণ্ণ ও ভীত দেখিয়া কহিলেন বৎস কপিঞ্জল!

এই দেখ পুণ্ডরীকের আয়ুষ্কর কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছি। তোমার সখা মহর্ষি জাবালির আশ্রমে আছেন। তোমাকে দেখিলেই চিনিতে পারিবেন। অতএব তুমি তাঁহার নিকটে গিয়া আমার এই আয়ুষ্কর কর্ম্ম সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে বল। এই কথা কহিতে কহিতে কপিঞ্জল অন্তরীক্ষে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

হারীত আমাকে যত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে পক্ষোদ্ভেদ হওয়াতে গমন করিবার শক্তি জন্মিল। একদা মনে মনে চিন্তা করিলাম, এক্ষণে উড়িবার সামর্থ্য হইয়াছে, একবার মহাশ্বেতার আশ্রমে গমন করি। এই স্থির করিয়া উত্তর দিকে উড়িতে লাগিলাম। উড়িবার অভ্যাস ছিল না, সুতরাং অল্প দূর গিয়াই ক্লান্ত ও পিপাসিত হইয়া পড়িলাম, তখন এক সরোবরের নিকটে জামবনে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করিলাম। সুস্বাদু ফল ভক্ষণ ও সুশীতল জল পান করিয়া ক্ষুৎপিপাসা শান্তি হইলে, নিদ্রাকর্ষণ হইতে লাগিল। পক্ষপুটের অন্তরালে চঞ্চুপুট নিবেশিত করিয়া সুখে নিদ্রা গেলাম। জাগরিত হইয়া দেখি জালে বদ্ধ হইয়াছি। সম্মুখে এক বিকটাকার ব্যাধ দণ্ডায়মান। তাহার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া কলেবর কম্পিত হইল। ব্যাধকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, তুমি কে? ও কি নিমিত্ত আমাকে জাল বদ্ধ করিলে? যদি আমিষ লোভে বদ্ধ করিয়া থাক, নিদ্রাবস্থায় কেন প্রাণ বিনাশ কর নাই? যদি কৌতুকের নিমিত্ত ধরিয়া থাক, কৌতুক নিবৃত্ত হইল, এক্ষণে জাল মোচন করিয়া দাও। কিরাত কহিল আমি চণ্ডাল বটে, কিন্তু আমি আমিষ লোভে তোমাকে জাল বদ্ধ করি নাই। আমাদিগের স্বামী পক্কণদেশের অধিপতি। তাঁহার কন্যা শুনিয়াছিলেন জাবালি মুনির আশ্রমে এক আশ্চর্য্য শুকপক্ষী আছে—সে মানুষের মত কথা কহিতে পারে। শুনিয়া অবধি অনেক ব্যক্তিকে ধরিবার আদেশ দিয়াছিলেন। অনেক

দিন অনুসন্ধানে ছিলাম। আজ জালবদ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে লইয়া গিয়া তাঁহাকে প্রদান করিব। তিনিই তোমার বন্ধন অথবা মোচনের প্রভু। কিরাতের কথায় অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলাম। ভাবিলাম আমি কি হতভাগ্য। প্রথমে ছিলাম দিব্য-লোকবাসী ঋষি, তাহার পর হইলাম সামান্য মানব, অবশেষে শুক জাতিতে পতিত হইয়া জালবদ্ধ হইলাম ও চণ্ডালের গৃহে যাইতে হইল।

কিরাত আমাকে পক্কণাভিমুখে লইয়া চলিল। কতকদূর গিয়া দেখি, কেহ মৃগবন্ধনের ফাঁদ প্রস্তুত করিতেছে, কেহ ধনুর্ব্বাণ নির্ম্মাণ করিতেছে, কাহার হস্তে কোদণ্ড, কাহার হস্তে লৌহ দণ্ড। সকলেরই আকার ভয়ঙ্কর। সুরাপানে সকলের চক্ষু জবা বর্ণ। কোন স্থানে মৃত হরিণশাবক পতিত রহিয়াছে। কেহ বা তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা মৃগ মাংস খণ্ড খণ্ড করিতেছে। পিঞ্জর বদ্ধ পক্ষিগণ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া চীৎকার করিতেছে, কেহ এক বিন্দু বারি দান করিতেছে না। সেখানকার পথ সকল কঙ্করময়, চতুর্দ্দিকে পশু কঙ্কাল বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সদ্যচ্ছিন্ন পশুরক্তে গৃহাঙ্গন কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। কোথাও বা মাংস অগ্নিদগ্ধ হইতেছে এবং তাহা হইতে দুর্গন্ধ ধূম উদ্গত হইতেছে। এই সকল দেখিয়া অনায়াসে বুঝিলাম উহা চণ্ডাল রাজের আধিপত্য। উহার আলয় যেন যমালয় বোধ হইল। কিরাত চণ্ডাল কন্যার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিল। কন্যা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কাষ্ঠের পিঞ্জরে আমাকে বদ্ধ করিয়া রাখিল। ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হইলাম। একদা পিঞ্জরের অভ্যন্তরে নিদ্রিত আছি, জাগরিত হইয়া দেখি, পিঞ্জর স্বর্ণময় ও পক্কণপুর অমরপুর হইয়াছে। চণ্ডাল কন্যাকে মহারাজ যেরূপ রূপলাবণ্য সম্পন্ন দেখিতেছেন ঐরূপ আমিও দেখিলাম। দেখিয়া অতিশয় বিস্ময় জন্মিল। সমুদয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া জানিব ভাবিয়াছিলাম, ইতিমধ্যে মহারাজের নিকটে আনীত হইয়াছি। ঐ কন্যা কে, কি নিমিত্ত চণ্ডাল কন্যা বলিয়া পরিচয় দেয়, আমাকেই বা কি

নিমিত্ত ধরিয়াছে, মহারাজের নিকটেই বা কি জন্য আনয়ন করিয়াছে, কিছুমাত্র অবগত নই।

রাজা শূদ্রক, শুকের এই দীর্ঘ উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া শেষ বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য অতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন। দ্বারীকে আজ্ঞা দিলেন শীঘ্র সেই চণ্ডাল কন্যাকে এইখানে লইয়া আইস। চণ্ডাল কন্যা শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া উদ্ধত বচনে কহিল—ভুবনভূষণ, কাদম্বরী-লোচনানন্দ, চন্দ্র! শুকের ও আপনার পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত অবগত হইলে। পক্ষী পিতার আদেশ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক মহাশ্বেতার নিকট যাইতেছিল তাহাও শুনিলে। আমি ঐ দুরাত্মার জননী লক্ষ্মী। মহর্ষি কালত্রয়দর্শী আমাকে কহিলেন, তুমি ভূতলে গমন কর এবং যতদিন আরব্ধ কর্ম্ম সমাপ্ত না হয় ততদিন তোমার পুত্রকে তথায় বদ্ধ করিয়া রাখ। কি জানি যদি কর্ম্মদোষে আবার পক্ষীজাতি অপেক্ষাও অন্য কোন নীচ জাতিতে পতিত হয়। আমি মহর্ষির কথামত উহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। অদ্য কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়াছে এই নিমিত্ত তোমাদিগের পরস্পর মিলন করিয়া দিলাম। এক্ষণে এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন অভীষ্ট বস্তু লাভ কর, এই বলিয়া লক্ষ্মী অদৃশ্য হইলেন।

লক্ষ্মীর বাক্য শুনিয়া রাজার জন্মান্তর বৃত্তান্ত সমুদয় স্মরণ হইল।

এদিকে বসন্তকাল উপস্থিত। কাননে কোকিলের ডাক, পবনে কুসুম সুরভি, দিকে দিকে অলির ঝঙ্কার।

কাদম্বরী তখন এক দিন সায়াহ্নে সরোবরে স্নান করিয়া ভক্তি ভাবে অনঙ্গদেবের অর্চ্চনা করিলেন। চন্দ্রাপীড়ের শরীর ধৌত ও মার্জ্জিত করিয়া গাত্রে চন্দন লেপন করিয়া দিলেন এবং কণ্ঠদেশে কুসুম মালা ও কর্ণে অশোক-স্তবক পরাইয়া দিয়া যেমন চন্দ্রাপীড়ের মৃত দেহ গাঢ় আলিঙ্গন করিবার উপক্রম করিতেছেন, অমনি চন্দ্রাপীড় পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিলেন। কাদম্বরী ভয়ে কাঁপিতেছেন, চন্দ্রাপীড় সম্বোধন করিয়া

কহিলেন, ভয় কি ? এই দেখ, আমি পুনর্জীবিত হইয়াছি। আজ শাপের অবসান হইয়াছে। এত দিন বিদিশা নগরীতে শূদ্রক নামে নরপতি ছিলাম, অদ্য সে শরীর পরিত্যাগ করিয়াছি। তোমার প্রিয় সখী মহাশ্বেতার মনোরথও আজ সফল হইবে। বলিতে বলিতে চন্দ্রালোক হইতে পুণ্ডরীক নভোমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার গলে সেই একাবলী মালা ও বাম পার্শ্বে কপিঞ্জল। কাদম্বরী প্রিয় সখীকে প্রিয় সংবাদ শুনাইতে গেলেন। চিত্ররথ ও হংসকে এই শুভ সংবাদ শুনাইবার নিমিত্ত কেয়ূরক হেমকূটে গমন করিল। মদলেখা, তারাপীড় ও বিলাসবতীর নিকটে গিয়া কহিল—যুবরাজ আজ পুনর্জীবিত হইয়াছেন। রাজা ও রাণী, শুকনাস ও মনোরমা এই বিস্ময়কর শুভ সমাচার শ্রবণে পরম পুলকিত হইয়া শীঘ্র আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রাপীড় জনক জননীকে সমাগত দেখিয়া বিনীত ভাবে প্রণাম করিবার নিমিত্ত মস্তক অবনত করিতেছিলেন, রাজা অমনি বাহু প্রসারিত করিয়া ধরিলেন। কহিলেন বৎস ! তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্ চন্দ্রমার মূর্ত্তি। তুমিই সকলের নমস্য। আজ জীবন সার্থক। ধর্ম্ম কর্ম্ম সফল হইল। বিলাসবতী সস্নেহে পুত্রকে ক্রোড়ে করিলেন। চন্দ্রাপীড় শুকনাস ও মনোরমাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ইনিই বৈশম্পায়নরূপে আপনাদিগেরপুত্র হইয়াছিলেন এই বলিয়া পুণ্ডরীকের পরিচয় দিলেন। পুণ্ডরীক জনক জননীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন।

সকলের নানারূপ কথা প্রসঙ্গে রজনী প্রভাত হইল। প্রাতঃকালে চিত্ররথ ও হংস তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমুদয় গন্ধর্ব্বলোক আহ্লাদে পুলকিত হইয়া আগমন করিল। গন্ধর্ব্বপতির সহিত নরপতির এবং হংসের সহিত শুকনাসের বৈবাহিক সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হওয়াতে তাঁহারা নব নব উৎসব ও আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন।

চিত্ররথ সাদর সম্ভাষণে কহিলেন মহারাজ ! সকল মনোরথ সফল

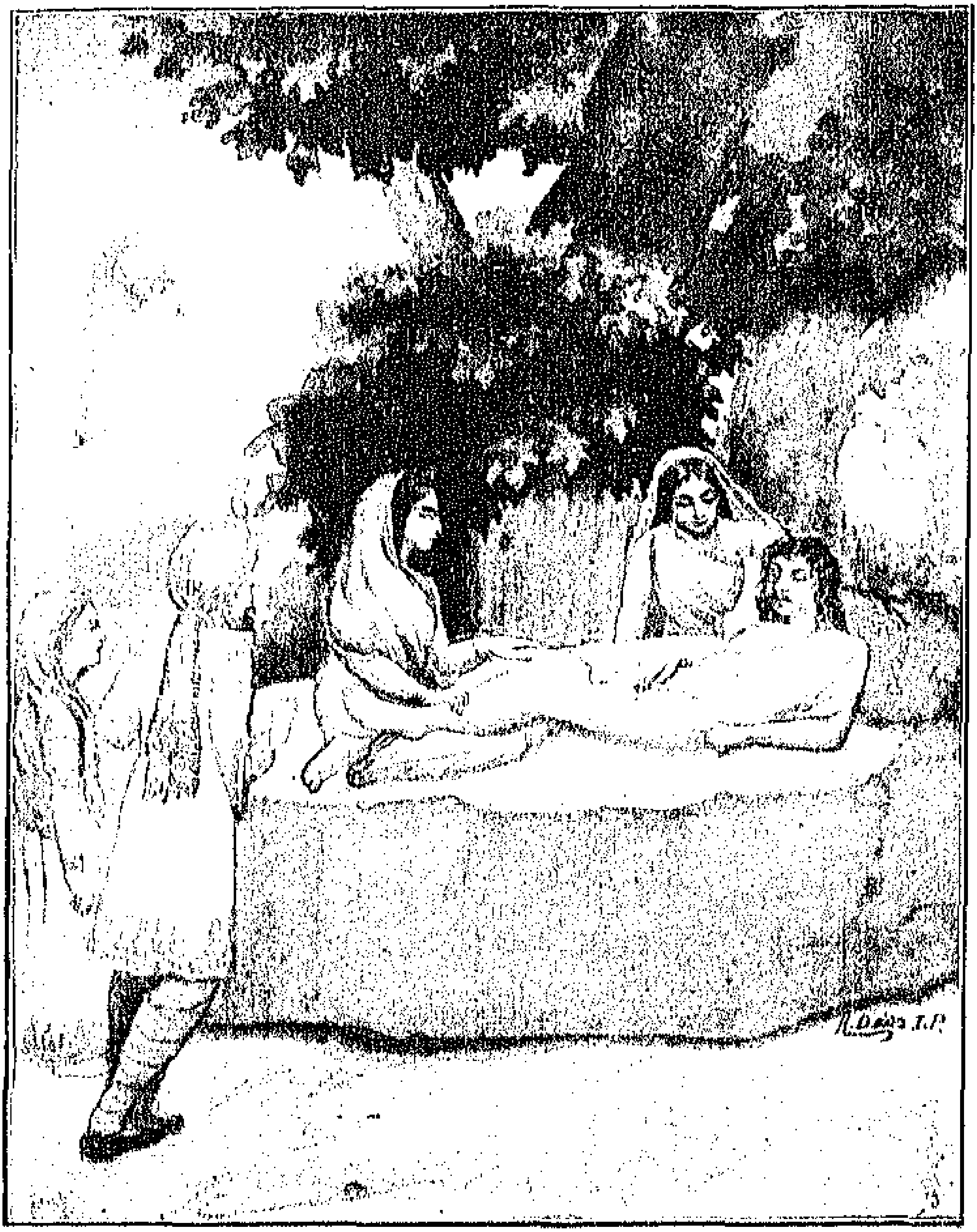

বলিতে বলিতে চন্দ্রলোক হইতে পুণ্ডরীক নভোমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন।

হইল। এক্ষণে এই অধীনের সদনে পদার্পণ করিয়ে চন্দ্রাপীড়কে কাদম্বরী প্রদান ও রাজ্য দান করিয়া চরিতার্থ হই। তারাপীড় উত্তর করিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ! আমি এই আশ্রমকেই সুখের ধাম ও আপন আলয় বলিয়া স্থির করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এই স্থানেই জীবন যাপন করিব। তুমি বধূ সহিত চন্দ্রাপীড়কে আপন আলয়ে লইয়া যাও এবং বিবাহ মহোৎসব নির্ব্বাহ কর। আমি এই আশ্রমেই থাকিলাম।

চিত্ররথ ও হংস জামাতা ও কন্যাকে আপন আপন আলয়ে লইয়া গেলেন এবং মহা সমারোহে মহামহোৎসব আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে উভয়েই জামাতার প্রতি আপন আপন রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

এইরূপে চন্দ্রাপীড় ও পুণ্ডরীক পরম সুখী হইয়া রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। একদা কাদম্বরী বিস্মিত চিত্তে চন্দ্রাপীড়কে জিজ্ঞাসা করিলেন নাথ! সকলেই মরিয়া পুনর্জ্জীবিত হইল, কিন্তু সেই পত্রলেখা কোথায় গেল জানিতে বাসনা হয়।

চন্দ্রাপীড় কহিলেন, আমি শাপগ্রস্ত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিলে রোহিণী আমার পরিচর্য্যার নিমিত্ত পত্রলেখারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে পুনর্ব্বার চন্দ্রলোকে দেখিতে পাইবে। এই বলিয়া তাঁহার কৌতুক ভঞ্জন করিয়া দিলেন।

হেমকূটে কিছুকাল বাস করিয়া চন্দ্রাপীড় আপন রাজধানী উজ্জয়িনী নগরে গমন করিলেন।